মাঘ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

কলকাতায় জাতীয় ফুটবল

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড : ইন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো অবলুপ্ত পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী
সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়ীতে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।

আম-কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় যেতে যেতে,
শান-বাঁধানো ঘাট দেবো
পথে জল খেতে।

বুলুর মা বুলুকে এই ছড়াটা শোনাতেই ডুকরে কেঁদে উঠল সে। বুলুর মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদিস কেন ?
বুলু কাঁদতে কাঁদতে বললে, তোমার সঙ্গে আড়ি। কথা বলব না। তুমি দুষ্টু। আমি যখন শ্বশুরবাড়ি যাবো, তখন যদি ঐ হুলোটা আমার সঙ্গে যায়, আমি কোনদিনও যাব না।
বুলুর মা বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, যাবেনা। এবার চুপ কর। বুলুর তবু কান্না থামে না। কি হল, এখনো কেন কাঁদিস ? বুলু বললে, আমি কি গাছতলা দিয়ে বিয়ে করতে যাবো নাকি ? তবে, কোথা দিয়ে যাবি ?
আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বুলু বললে, আমি বিয়ে করতে যাবো ভূগর্ভো রেলে চেপে, দমদমে। বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে আমার। বাবা বলেছে, ভূগর্ভো রেল হলে এক পলকে শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি যেতে-আসতে পারবো।

Mtp

কলকাতায় নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭
মাঘ ১৩৮৪ জানুয়ারি ১৯৭৮ তৃতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প — হাতি-চোর । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৭
অ্যাপোলো ও লরেল । জয়ন্তী সান্যাল ২৫
স্লেট পেনসিল । দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২

ছড়া — রাজকাহিনী । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১১
প্রশ্নোত্তর । রেবন্ত গোস্বামী ৪৩

বিশেষ রচনা — বেলুনে চেপে সাগর পাড়ি । সন্দীপ সরকার ৪

আত্মকথা — খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৪

উপন্যাস — বন্ধ ঘরের আওয়াজ । সমরেশ বসু ১৮
অলৌকিক । বিমল কর ৩৭

কমিক্‌স — ভুতুড়ে গাড়ি ১২, টারজান ২২, টিনটিন ৩০
গাবলু ৫০, নোলেদা ৫৩

খেলাধুলো — স্মরণীয় পরাজয় । চিরঞ্জীব ৪৪
ফুটবলের জমজমাট আসর । পুষ্পেন সরকার ৪৬
সন্তোষ ট্রফির লড়াই । শ্রীখেলোয়াড় ৪৭
রোভার্স পেল মোহনবাগান । মুকুল দত্ত ৪৯

লেখাপড়া — কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

ধাঁধা-মজা-রহস্য — আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯
কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা — তোমাদের পাতা ২৪, মজার পড়া । কুন্তক ৩৬
শান্তনু মণ্ডলের প্রদর্শনী ৪১
ডেডো-তাতাই । তারাপদ রায় ৫১
বিশ্ববিচিত্রা । দিদিমণি ৫১
মণিমেলার খবর ৫২, সার্কাস ৫২
আঁকো । রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪, শেখো । কারিগর ৫৪

প্রচ্ছদ — অলোক ধর

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত ।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

বেলুনে চেপে সাগর পাড়ি

সন্দীপ সরকার

বেলুন হাতে পেলে নিশ্চয় ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে ফেল। আমার কিন্তু পাড়ার রোগাপটকা বেলুনওয়ালার মুখটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। একটা চার চাকার কাঠের গাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার বসিয়ে ঠেলে সে। তার হাতে থাকে লাল নীল হলুদ নানা রঙের নানা আকারের বেলুন। শব্দটা শুনে কারো কারো অবশ্য বেলুন-চাকির কথাও মনে পড়তে পারে।

কিন্তু শব্দটা শুনলে তোমাদের কি আর ফানুসের কথা মনে আসে? ফানুস তো আর কিছুই নয়, কাগজের তৈরি বিরাট ঠোঙা। নীচে একটা বাতি থাকে। দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে সেটা জেবলে দিলে ফানুসের ভেতরের হাওয়া গরম হয়ে ওঠে। গরম হলেই বাতাস হালকা হয়ে যায়। তখন বাইরের ভারী হাওয়ার মধ্যে ফানুস গা ভাসিয়ে উড়ে যায়। ফানুসে

১৭৮৩ সালের সেই বেলুন

বেলুন সমুদ্রে পড়লে ইঁদুর গিয়ে উদ্ধার করবেন

আগুন লেগে যেতে নিশ্চয় দেখেছ।

ফানুসকেও ইংরিজিতে বেলুন বলে। কথাটা এসেছে অবশ্য ফরাসী 'বালোঁ' থেকে। আর বালোঁ এসেছে 'বল' থেকে। এমনি বেলুনই বলো, আর ফানুসই বলো, গোলগাল বলের মতোই দেখতে।

আজকে তোমাদের ফানুসের কথাই বলব। একটা বিরাট থলেকে বাতাসের চেয়ে হালকা উত্তপ্ত হাওয়া বা গ্যাস ভর্তি করে ফোলান হয়। সাধারণত বাতাসের চেয়ে হালকা বলে হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম গ্যাস ভরা হয়।

এই ফোলানো থলের সঙ্গে একটা বড়-মাথা খোলা বাক্স দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা থাকে। দেখতে অনেকটা প্যারাস্যুটের মতো হয়। এই বাক্সে যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র, খাবার-দাবার নিয়ে দু চার জন যাত্রী উড়তে পারে আকাশে। বেলুনের তলায় ঝুলন্ত বাক্সকে বলা হয় 'কার' বা 'গণ্ডোলা'।

আকাশে পাখির মতো ওড়ার স্বপ্ন মানুষ সেই আদ্যিকাল থেকেই দেখেছে। পুষ্পকরথের কল্পনা করেছিলেন মহাকবি বাল্মীকি। শ চারেক বছরের কিছু বেশিই হবে, বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি আকাশযানের নকশা মাথা খাটিয়ে এঁকে পর্যন্ত ফেলেছিলেন। আজকে জাম্বো জেট আর গ্রহান্তরে যাবার যান তৈরি হয়েছে, কিন্তু তার পেছনে কত শ বছরের স্বপ্ন, পরিকল্পনা এবং পরিশ্রম আছে, সেটা ভাবো একবার। বেলুনকে তাই প্লেন এবং মহাকাশযানের আদিপুরুষ বলে ধরা হয়।

বেলুন আকাশে ওড়ায় ফরাসীরাই সর্বপ্রথম ২১শে নভেম্বর ১৭৮৩। পারি শহরের সব লোক ভেঙে পড়েছিল ব্যাপারটা দেখতে। এটা তৈরি করেন এতিয়্যান মঁগলফিয়্যার। গরম হাওয়াভর্তি বেলুনের খোলটা ছিল মস্ত-মস্ত কাগজ জুড়ে তৈরি বিরাট একটা ঠোঙা। এমন ফোলানো-ফাঁপানো ঠোঙার নীচেকার গণ্ডোলায় বসে চুল্লিতে কাঠকুটো পুরে ফানুসটাকে ভাসমান রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিপজ্জনক এই বেলুনটা দেখে ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই মন্তব্য করেছিলেন, পরীক্ষামূলকভাবেও কেউ এই বেলুনে উড়তে চাইবে না। দরকার পড়লে আমাকে বলো, দুটো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীকে দেব। তাদের চড়িয়ে দেবে।

অবশ্য প্রথমে যে দু'জন বেলুন চেপে আকাশে উড়েছিলেন তাঁরা কিন্তু কেউ কয়েদী নন—পিলাত্র দ্য রজিয়্যার এবং মারকুই দারলাঁদ। এঁরা কুড়ি মিনিট ধরে তিন হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়েছিলেন প্যারিসের এদিক থেকে ওদিক।

কিছু দিন ধরে পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক শার্ল হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন নিয়ে পরীক্ষা করেন। ১৭৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শার্ল হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন ওড়ান। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন।

একজন মন্তব্য করলেন, "শার্লের বেলুন মানুষের কী উপকারে লাগবে?"

ফ্রাংকলিন শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "নবজাত শিশু কার উপকারে লাগে?"

এর দু বছর পর ফ্রান্স থেকে বেলুন চেপে ইংলিশ চ্যানেল টপকে ইংলণ্ডে যান ব্লাশার্দ। ভার কমানোর জন্যে এক সময় তিনি সব খুলে নীচে ফেলে দেন। এমন কী, তার প্যান্ট পর্যন্ত। শুধু আণ্ডারওয়ার পরে তিনি ইংলণ্ডে নেমেছিলেন। দুঃসাহসিকতার জন্যে ব্লাশার্দের আমৃত্যু ভাতার ব্যবস্থা করেন ষোড়শ লুই। হতভাগ্য পিলাত্র দ্য রজিয়্যার ব্লাশার্দের দেখাদেখি বেলুনে চেপে ইংলিশ চ্যানেল পেরুতে গিয়ে ডুবে মারা যান। ১৮১৯ সালে ব্লাশার্দের স্ত্রী বেলুনে উড়তে গিয়ে প্রাণ দেন।

আজকের পাইলট এবং অ্যাস্ট্রোনটদের যুগে বসে হয়তো বেলুন যাত্রীদের কথা ভাবলে তোমার হাসি পেতে পারে। আজকের নভশ্চরদের চেয়ে এঁদের দুঃসাহস কিন্তু কম ছিল না। কারণ ফানুস-আঁটা নড়বড়ে একটা বাক্সে বসে তাঁরা প্রাণ হাতে করে উড়েছেন। এক হিসাবে বলা যায় যে, বেলুন যদি বীজ হয়, তাহলে প্লেন হল চারাগাছ, আর মহাকাশযান বৃক্ষ। বেলুনে চেপে মানুষের ওড়াউড়িতে সমস্ত ইউরোপে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। ফরাসী দেশে তো কথাই নেই। প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুলে ভার্ন এ নিয়ে রহস্যময় দ্বীপের রোমহর্ষক কাহিনী লিখে ফেলেছিলেন। তোমরা হয়তো বইটা পড়েছ।

এর পর থেকে ফরাসীরা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে বেলুন তৈরি করতে লেগে গেল। গত শতাব্দীতে বিসমার্কের জার্মান সৈন্য এসে পারি শহরটা ঘিরে ফেলে। অবরুদ্ধ শহরবাসীরা বুঝতে পারল, বেলুন চেপে শত্রুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। কখনো কখনো জার্মানদের গুলি খেয়ে বাণবিদ্ধ পাখির মতো মুখ থুবড়ে পড়েছে বেলুন। ফরাসীরা বেলুন নিয়ে কেমন পাগল ছিল, একটা ব্যাপারে সেটা বোঝা যায়। শত্রু-পরিবেষ্টিত পারি শহরের আকাশে উঠে একজন বৈজ্ঞানিক সূর্যগ্রহণ দেখেছিলেন।

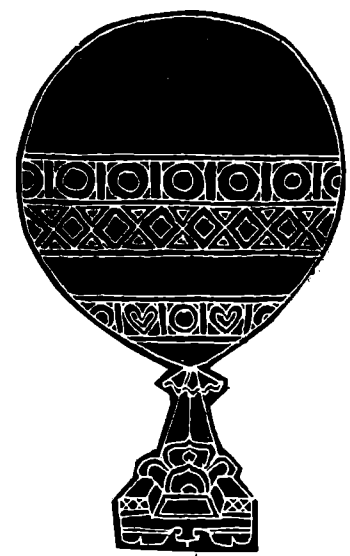

ইউজিন গোদার আট শ বার বেলুনে চেপে আগেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি একটা বেলুন তৈরির কারখানাই খুলে ফেলেছিলেন এইসময়। তাছাড়া বেলুনে ওড়া শেখাবার ইস্কুলও করেছিলেন।

পারি শহর অবরুদ্ধ থাকার সময় ছেষট্টিটা বেলুন ডাক নিয়ে উড়ে গিয়েছিল। এগারো টন সরকারী কাগজপত্র এবং পঁচিশ লক্ষ চিঠি শত্রুর মাথার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য হাওয়ার গতি অন্যদিকে হলেই বিপদ হত। হলাণ্ড বা বেলজিয়াম ফরাসীদের বন্ধু-দেশ। সুতরাং বেলুন নামলে ক্ষতি ছিল না। দু-একবার বেলুন জার্মানদের মধ্যে পড়েছে। একবার একটা বেলুন পনেরো ঘণ্টা উড়ে গিয়ে পড়ে ন শ' মাইল দূরে বরফ ঘেরা নরওয়েতে। তবু বেলুনে করে চিঠিপত্র পাঠাতে পেরেছিল বলে শত্রু পরিবেষ্টিত পারির লোকজন হতাশায় ভেঙে পড়েনি।

১৮৭৩ সালে তিন জন বেলুনযাত্রী আটলান্টিক মহাসাগর পার হবার চেষ্টা করেন। ষাট মাইল গিয়ে বেলুনটা গোঁত্তা খেয়ে

পড়ে। ১৮৮১ সালে আবার আরেক দল একই চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৯৫৮ পর্যন্ত বেলুনে করে আটলান্টিক পাড়ি দেবার দুঃসাহস দেখাননি আর কেউ। এই বছরে চার জন ব্রিটিশ অভিযাত্রী আটলান্টিক পেরুবার চেষ্টা করেন। সফল হননি অবশ্য। এরপর এগারোবার এই চেষ্টা হয়। কিন্তু এগারোবারই অভিযাত্রীরা ব্যর্থ হন।

সব শেষের বার আটলান্টিকের ওপর দিয়ে 'সিলভার ফক্স' নামে একটা বেলুনে চেপে পাড়ি দেন এড ইয়ুস্ট। তাঁর তিন জন সহযোগী রিচার্ড কিউসার, জেরি মেলসা এবং ব্রুস হফার তাঁকে এই বেলুন তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। ওড়বার সময় পর্যন্ত খাটা-খাটনি করার জন্যে ইয়ুস্টের সঙ্গে ছিলেন তিনজনই। সিলভার ফক্সের সঙ্গে রেডিওতে সংবাদ আদানপ্রদান যাতে চালু থাকে,তার জন্যে ভেরা সাইমন এবং কর্নেল জোস্টে কিটিঙ্গার (ছোট) ওয়াশিংটন এবং লন্ডনে দুটো রেডিও স্টেশন চালু রাখেন। পাকাপাকি সব ব্যবস্থা ছিল। সিলভার ফক্সে বসেই ইয়ুস্ট বড় বড় যাত্রিবাহী প্লেন কোম্পানির কাছে আবহাওয়া কেমন যাবে তার খবর পেতেন নিয়মিত।

৫ই অক্টোবর ১৯৭৬ সিলভার ফক্স বেলুনে চেপে যাত্রা করেন এড। মার্কিন মুলুকের মেইন রাজ্যের মিলব্রিজ থেকে রওনা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাবেন তিনি। তাঁর নিশ্চয় মনে পড়েছিল, গত দশ বছরে বারোজন অভিযাত্রী এই চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। পাঁচজন মারাও গেছেন।

ইউরোপ তাঁর গন্তব্য। কিন্তু এডের মনে অনেক স্বপ্ন। বেলুনে সবচেয়ে বেশিক্ষণ থাকবেন। বেশি উঁচু দিয়ে উড়ে যাবেন

তিনি। তাঁর মনের ইচ্ছা, ষাট বছরের পুরনো জার্মানদের রেকর্ড ভাঙবেন।

বেলুন আস্তে আস্তে আকাশে ওড়ে। হাত নাড়েন এড। নীচে দাঁড়িয়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব রুমাল নাড়ে। আটলান্টিক পেরুবার জন্যে তৈরি অন্যান্য বেলুনের চেয়ে সিলভার ফক্স ছোট। মাত্র আশি ফুট উঁচু। নাইলনের ফানুস। তার মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস পোরা হয়েছে। বেলুন আর গণ্ডোলা মিলিয়ে দু টনের কম ওজন, গণ্ডোলাটা নৌকার মতো দেখতে। আটলান্টিকে পড়লে নৌকার মতো ভেসে থাকতে পারবে।

দুরন্ত হাওয়ায় সিলভার ফক্স ধীরে-ধীরে উত্তরে ভেসে চলে। প্রথম দিন সূর্যাস্তের সময় কানাডার সেন্ট লরেন্স উপসাগরে গিয়ে পৌঁছয়।

সব চুপচাপ। নীচে নীল সমুদ্র। ওপরে নীল আকাশ। একা এড। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে তাঁর। বাড়ির কথা। এমন বিচ্ছিন্ন মনে হয় নিজেকে! রাত্রির আকাশে তারা ফোটে। শিশুর মতো টলতে টলতে চাঁদ ওঠে। ঘুমিয়ে পড়েন এড। ঘুম ভাঙলে দেখেন জোনাকির মতো অসংখ্য তারা। কখনো দেখেন ভোর হচ্ছে, বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে সূর্য কেমন উঠল।

তৃতীয় দিন সকালে দক্ষিণ দিকে ভেসে আটলান্টিকের মাঝা-মাঝি পৌঁছয় সিলভার ফক্স। ওপরে মেঘ সূর্যের আলো ঢেকে দেয়। হিলিয়াম গ্যাস উত্তাপের অভাবে ঘন হয়। চুপসে যেতে থাকে বেলুন। গণ্ডোলায় মূল্যবান জ্বালানি পুড়িয়ে এড গরম করতে থাকেন হিলিয়াম। গণ্ডোলায় রয়েছে উচ্চতা মাপার অনেক যন্ত্রপাতি। তবু এড তাঁর নিজের নখ পরীক্ষা করেন। কারণ অক্সিজেনের অভাব হলে নখ নীল হয়ে যায়।

ঘুমিয়ে থাকার সময় বেলুন যাতে সমুদ্রে ঝপাত করে না পড়ে, তার ব্যবস্থা করেছেন এড। মোটর সাইকেলের হর্ন লাগানো ব্যারোমিটার আছে। বেলুন তিন হাজার ফুটের নীচে নামলেই হর্ন বেজে উঠবে আপনা থেকে।

একসময় খেয়াল হয় তাঁর, হাওয়ায় ভেসে বেলুন ইউরোপ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। শেষে খাবার জল রেডিও—টুকিটাকি সব ফেলে দেন নীচের সমুদ্রে। এতে আরেকদিন অন্তত হাওয়ায় ভেসে থাকা যাবে। এডের চোখে জল। শেষে সমুদ্রে নেমে আসে বেলুন। পর্তুগালের উপকূল থেকে মাত্র সাতশ মাইল দূর। এডকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল একটা জাহাজ।

মানুষ কি বেলুনে চেপে আটলান্টিক পেরুতে পারবে না? অবশ্যই পারবে। কে জানে, হয়তো তুমিই চড়বে সেই বেলুনের গণ্ডোলায়।

হাতি-চোর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মাহুতের নাম মুলচাঁদ। তার কালো কুচকুচে শরীর, খালি গা, শুধু একটা ধুতি মালকোচা এঁটে পরা। সেই ধুতির মধ্যে গোঁজা একটা ছুরি। লোকটির মুখখানা কিন্তু খুব দয়ালু-দয়ালু। মনে হয় না, কোনদিন ও ঐ ছুরি খুলে কারুকে মারতে পারে।

সকালবেলা তাকে দেখেছিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে মস্ত বড় একটা হাতির পিঠে চেপে দুলতে-দুলতে আসছে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ডাক-বাংলোর বারান্দায়। আমাদের দেখে সে লম্বা একটা সেলাম দিল। অমনি ঝর্নামাসীর ছেলে বুবুন বলে উঠল, "হাতি চড়ব, আমি হাতিতে চড়ব!"

ঝর্নামাসী বললেন, "না, না, অতবড় হাতির পিঠে চড়তে হবে না। বুনো হাতি!"

আমি বললাম, "বুনো হাতির পিঠে কি আর মাহুত থাকে? কোনো ভয় নেই। আমি বুবুনকে নিয়ে যাচ্ছি! এই মাহুত, দাঁড়াও!"

ডাক-বাংলো থেকে আমরা দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। হাতিটা তার ছোট্ট-ছোট্ট চোখ দিয়ে আমাকে আর বুবুনকে এক-বার দেখে নিল, তারপর ফ-র-র-র ফ-র-র-র শব্দ করতে লাগল মুখ দিয়ে।

আমি বললাম, "তোমার হাতিটাকে একটু নিচু করো না, মাহুত, আমরা একটু চড়ব!"

মুলচাঁদ হেসে বলল, "এ হাতিটা বড় দুষ্টু, সাহেব! আপনারা চড়লে ভয় পাবেন!"

বুবুন বলল, "না, আমরা ভয় পাই না! আমরা হাতিকে

ভয় পাই না!"

বুবুনের বয়েস মাত্র পাঁচ। সে সত্যি খুব সাহসী। সব সময় তার কোমরে দুটো খেলনা পিস্তল থাকে। সে বলেছে, এ পিস্তল দিয়ে সে এবার একটা বাঘ মারবে।

সে মাহুতকে আবার বলল, "আমাদের হাতির পিঠে চাপিয়ে বাঘের কাছে নিয়ে চলো না!"

মাহুত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সাহেব, আপনাদের কাল সকালে আমি হাতির পিঠে চড়াব। আজ আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। নদীর উজানে হাতির পাল নেমেছে।"

তাই শুনে আমি চমকে উঠে বললাম, "বুনো হাতির পাল?"

সে বলল, "হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "সেখানে তুমি যাবে? কেন, সেখানে গিয়ে তুমি কী করবে?"

সে বলল "দেখি, যদি একটা হাতি ধরতে পারি!"

"তুমি হাতি ধরো নাকি?"

"হ্যাঁ, সাহেব। লালজী সাহেব তো হাতি ধরার ব্যবসা করেন, আমি তার কাছেই কাজ করি।"

"তাই নাকি? নদীর ধারে যে কয়েকটা তাঁবু দেখেছি, সেগুলো বুঝি লালজীর তাঁবু?"

"হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল, তাহলে তো আমিও হাতি-ধরা দেখতে যেতে পারি। ওদের পেছনে-পেছনে চলে গেলেই হয়। বুবুনকে বললাম, "তুমি মা'র কাছে যাও তো। আমি একটু ঘুরে আসছি!"

ঐটুকু ছেলে, কিন্তু কী দারুণ বুদ্ধি! আমার দিকে চোখ গোল-গোল করে তাকিয়ে বলল, "তুমি বুঝি হাতি-ধরা দেখতে যাবে? তা হলে আমিও যাব।"

আমি বললাম, "না, আমি অন্য জায়গায় যাব!"

বুবুন বলল, "তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব।"

সারাদিন আর বুবুন আমার সঙ্গ ছাড়ল না। কিছুতেই আর ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারি না। একটু কোথাও গেলেই ও অমনি দৌড়ে চলে আসে।

আমাদের ডাক-বাংলোর সামনেই একটা নদী। তার নাম জয়ন্তী। খুব সুন্দর ছিমছাম একলা-একলা একটা পাহাড়ী নদী। দু' পাশেই জঙ্গল। খানিক আগে আছে একটা ছোট্ট রেল-স্টেশন। রেলের লাইন ওখানেই শেষ। বনের মধ্যে হঠাৎ এরকম এক জায়গায় রেল-লাইন শেষ হয়ে যেতে আমি আগে দেখিনি। সারা দিনে একটা ট্রেন আসে, আবার সেটাই ফিরে যায়। অন্য সময় একদম চুপ।

নদী পেরিয়ে আরও গভীর জঙ্গল। তার মধ্য দিয়ে আছে গাড়ি চলার রাস্তা। দূরের পাহাড় থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে রাস্তাটার ওপর দিয়ে নদীর মতন বয়ে যায়। ঐ সব পাহাড় থেকেই নেমে আসে বুনো হাতির পাল। আচমকা কখনো শোনা যায় বাঘের ডাক।

আমাদের বাংলোর খুব কাছেই একটা বড় শালগাছ থেকে মাঝে-মাঝে ডেকে ওঠে একটা তক্ষক সাপ। ঝর্নামাসী কখনো তক্ষক সাপ দেখেননি। সেই ডাক শুনলেই আমাকে বলেন, "দ্যাখ তো, দ্যাখ তো, সাপটাকে দেখা যায় কি না।"

আমি ছুটে যাই। বুবুনও যায়। কিন্তু সেটাকে কিছুতেই দেখা যায় না।

সন্ধের দিকে দারুণ হৈচৈ শোনা গেল।

ছুটে রাস্তার ধারে গিয়ে দেখলাম, অনেক লোক এক সঙ্গে চ্যাঁচামেচি করছে। আর মাহুত মুলচাঁদ বলছে, "আস্তে, আস্তে, চ্যাঁচাবেন না। ও ভয় পাবে!"

কে ভয় পাবে?

ভিড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখলাম, মুলচাঁদের সেই মস্ত বড় হাতিটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাচ্চা হাতি। তার গায়ের সবুজ-সবুজ রং দেখলেই বোঝা যায়, সদ্য বন থেকে এসেছে।

মুলচাঁদ ধরে এনেছে ঐ বাচ্চা হাতিটাকে!

বুবুন অমনি লাফাতে লাগল, "আমি ঐ বাচ্চা হাতিটায় চড়ব! আমি ঐ বাচ্চা হাতিটায় চড়ব!"

বাচ্চা হাতিটা এত লোক দেখে ঘাবড়ে গেছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বড় হাতিটার পেটের নীচে ঢুকে পড়তে চাইছে। বড় হাতিটা দু'চার পা এগিয়ে গেলেই সেও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে।

লোকজনের ভিড় সরিয়ে দেওয়া হল। আর মুলচাঁদ তখন দৌড় করাতে লাগল বড় হাতিটাকে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে বড় হাতিটা গোল হয়ে ছুটছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে যাচ্ছে বাচ্চা হাতিটা।

খানিক বাদে মুলচাঁদকে আর শেখাতে হল না। তার হাতি নিজেই ছুটতে লাগল সেই এক জায়গায়। আর মুলচাঁদ একটা গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে লাগল।

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, "ভাই মুলচাঁদ, হাতি দুটো শুধু এইটুকু জায়গায় ওরকম দৌড়চ্ছে কেন?"

মুলচাঁদ বলল, "সাহেব, বাচ্চা হাতিটা না হলে যে ভয় পেয়ে যাবে। দৌড়তে থাকলে ও ভাববে, ও এখনো ওর দলের সঙ্গেই যাচ্ছে।"

"এ রকম কতক্ষণ দৌড়বে?"

"তা ধরুন, সারা রাত!"

"কী করে ধরলে হাতিটাকে? বাচ্চা হাতিটা কি বনের মধ্যে একলা-একলা ঘুরছিল?"

শুধুমাত্র পাশ করতে নয়,
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বেশী নম্বর তুলতে
অদ্বিতীয় অভিনব এক বই!
AN ANALYTICAL APPROACH TO
EXHAUSTIVE
QUESTIONS
FOR
NINETEEN SEVENTYEIGHT & NINETEEN SEVENTYNINE
Price : Rs. 15/- only
এ বই কিনলে TEST PAPER
কেনার আর দরকার হয় না
B. B. KUNDU & SONS
18L, TAMER LANE, CALCUTTA-9
Phone : 34-7328

''না, সাহেব। বাচ্চা হাতি কক্ষনো একলা থাকে না। দলের মধ্যে থাকে।''

"তা হলে কী করে দল থেকে একলা ওটাকে বার করে আনলে?"

''বুনো হাতির পালের মধ্যে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হাতিটাকে ছেড়ে দিই! ও মিশে যায় দলের মধ্যে। তারপর এক সময় করে কী, একটা বাচ্চা হাতিকে দু পায়ের ফাঁকে আটকে চট করে থেমে যায়। অন্য হাতিগুলো কিছু বুঝতে পারে না, তারা এগিয়ে যায় সামনের দিকে। তখন আমাদের পোষা হাতিটা ঐ বাচ্চা হাতিটার মুখ ঘুরিয়ে দেয় অন্য দিকে। তারপর বড়টা চলতে শুরু করলেই ছোটটা তার পেছন-পেছন আসে।''

"বাবাঃ, তোমরা হাতিকে এরকমভাবে ট্রেনিং দাও?"

মূলচাঁদ লাজুক হেসে বলল, ''সে হুজুর, আপনাদের দয়ায় হয়ে যায়।''

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ''এবার ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করবে? বিক্রি করে দেবে?"

মূলচাঁদ বলল, ''না, এত তাড়াতাড়ি কি হয়! কালই ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওর মা যদি টের পেয়ে যায়, তা হলে ফিরে আসতে পারে। ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কয়েকদিন ট্রেনিং দিতে হবে।''

"যদি ওর মা ফিরে আসে, তা হলে কী হবে?"

মূলচাঁদ কপালে হাত ছুঁইয়ে বলল, "বাবুসে-কথা বলবেন না! সে বড় বিপদের কথা! তবে, সাধারণত আসে না। হাতির পাল এক রাতে অনেক দূর চলে যায়!"

আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেই হাতির দৌড় দেখলাম। তারপর ফিরে এলাম ডাক-বাংলোতে। বুবুন প্রবল উৎসাহে ছোট মাসীকে শোনাতে লাগল হাতির গল্প।

সেই রাতে এক তুমুল কাণ্ড হল। সন্ধের পরই চারদিকে একদম নিঝুম হয়ে যায়। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাও বন্ধ হয়ে যায় অন্ধকার নামার পর থেকেই। রাত্তির বেলা আমরা তখন খেতে বসেছি, এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে অনেক লোকের চিৎকার শোনা গেল। জঙ্গলের মধ্যে এত লোক কোথায় ছিল কে জানে।

আমরা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলাম, নদীর ওপারে জঙ্গলের মধ্যে কিছু লোক মশাল নিয়ে ছোটাছুটি করছে। মেসোমশাই বললেন, "ডাকাত পড়ল নাকি?"

ঝর্নামাসী বললেন, "এই জঙ্গলের মধ্যে ডাকাত?"

তারপরই হাতির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। একটা নয় অনেকগুলো। ক্রমেই কাছাকাছি এগিয়ে আসতে লাগল সেই শব্দ।

কারুকে কিছু বলে দিতে হল না, আমরা বুঝে গেলাম, বুনো হাতির পাল আসছে এদিকে।

এর আগে আমরা শুনেছিলাম, কয়েক মাইল আগে রাজা-ভাত-খাওয়া নামে একটা স্টেশনের ওপরে মাঝে মাঝে এসে পড়ে বুনো হাতির দল। স্টেশন মাস্টারের ঘরে পর্যন্ত ঢুকে যায়। গুদাম-ঘরের দরজা ভেঙে ফেলে শুঁড় দিয়ে খুঁজে দেখে, সেখানে তাদের কোনো খাবার আছে কি না।

এবার কি এখানেও হাতির পাল আসছে?

মেসোমশাই বললেন, "বন্দুকটা আনলে হত দেখছি।"

ঝর্নামাসী বললেন, ''একটা বন্দুক দিয়ে ক'টা হাতি মারতে তুমি? মনে তো হচ্ছে, একশো-দু'শোটা হাতি আসছে!''

দূরে জঙ্গলের মধ্যে লোকেরা দুমদাম করে আওয়াজ করছে। কয়েকটা মশাল উড়ে যাচ্ছে বনের মাথা দিয়ে। বোধহয় ওরা মশাল ছুঁড়ে হাতির পালকে ভয় দেখাতে যাচ্ছে।

কিন্তু হাতিরা ভয় পেল না।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছে, বেশি অন্ধকার নেই। আমরা এক সময় দেখতে পেলাম, ব্রিজের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো-তিনটে হাতি। তার মধ্যে একটা হাতি একলা ব্রিজের মাঝখানে এসে শুঁড় উঁচু করে খুব জোরে ডাকল।

সেই ডাক শুনেই আমাদের বুক মুচড়ে উঠল। ডা অসম্ভব করুণ। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ওটা একটা মা-হা ঠিক যেন কাঁদছে তার সন্তানের জন্য।

দূরে লালজীর তাঁবুর দিক থেকে গুড়ুম-গুড়ুম করে কয়েকটা বন্দুকের শব্দ হল। ঝর্নামাসী বললেন "গুলি চালাচ্ছে, গুলি চালাচ্ছে, শিগগির ঘরের মধ্যে চলে এসো!''

আমি বললাম, ''এগুলো নিশ্চয়ই ফাঁকা আওয়াজ। হাতি-ধরার লোকেরা গুলি করে হাতি মারে না। সে-রকম নিয়ম নেই।''

বন্দুকের আওয়াজেও হাতির পাল ভয় পেল না। সেই মা-হাতিটা আর একবার ডাকল করুণ গলায়। তারপর দৌড়ে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে। তার পেছনে আরো হাতি! অনেকগুলো। শুধু মাথার পর মাথা এগিয়ে আসছে। সর্বনাশ। ওরা রেগে গেছে। যদি এদিকে এসে সব কিছু তছনছ করে দেয়? এমন কী, ওরা এই ডাক-বাংলোটাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

বুবুন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রকম আওয়াজে সে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে এল বারান্দায়। কিছুই বুঝতে না পেরে সে 'মা মা' বলে কেঁদে উঠল।

ঝর্নামাসী চট করে তাকে কোলে তুলে নিলেন। যেন তাঁর ছেলেকেই কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে!

এমন সময় দেখলাম, এদিক থেকে মূলচাঁদ সেই বাচ্চা হাতিটার ল্যাজ মোচড়াতে মোচড়াতে নিয়ে আসছে। একা। হাতির পাল এক্ষুনি বোধহয় ওকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।

আমরা ভেবেছিলাম মূলচাঁদ নিশ্চয়ই বাচ্চা হাতিটাকে ফেরত দিতে যাচ্ছে তার মায়ের কাছে। কিন্তু দেখলাম, মূলচাঁদ চুপি চুপি সেটাকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে নদীতে। ঝর্নামাসী শিউরে উঠে বললেন, "ওমা, ও লোকটা যাচ্ছে কোথায়?"

মেসোমশাই গম্ভীরভাবে বললেন, "ও হাতিটাকে নিয়ে পালাচ্ছে!"

সত্যিই মূলচাঁদ হাতিটাকে নিয়ে জলে নেমে পড়ল। বুবুন বলল, "হাতিটা জলে ডুবে যাবে না?"

আমি বললাম, "হাতিরা বোধ হয় জন্ম থেকেই সাঁতার জানে।"

এরপর আমাদের আর কিছু দেখা হল না। অনেকগুলো হাতি দুদ্দাড় করে চলে এল এদিকে। আমরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। হাতিগুলো সাঙ্ঘাতিক রেগে গেছে মনে হয়। ডাক-বাংলোর বারান্দায় আমাদের দেখতে পেলে যদি তেড়ে আসে? আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু হাতিগুলোর চিৎকারে আমাদের বুক কাঁপতে লাগল। কয়েকটা হাতি এসে ধাক্কা মারলেই আমাদের এই কাঠের ডাক-বাংলোটা ভেঙে পড়বে।

অনেক্ষণ ধরে চলল হাতিদের চ্যাঁচামেচি। সেই সঙ্গে দুম-দাম করে পটকার শব্দ আর গুলির শব্দ। যেন এক দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে। তারই মধ্যে বুবুন তার খেলনা পিস্তল দুটো হাতে নিয়ে বলতে লাগল, "আমিও যুদ্ধ করব, আমিও যুদ্ধ করব, আমাকে ছেড়ে দাও!" আমরা ওকে জোর করে ধরে রাখলাম।

শেষ পর্যন্ত এক সময় সব শব্দ আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল। আমরা একটু একটু জানলা ফাঁক করে বাইরে দেখলাম। কিছুই দেখা গেল না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই আমরা ছুটে এলাম বাইরে। সত্যিই যুদ্ধক্ষেত্রের মতন অবস্থা। চার পাঁচটা বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে রাস্তার ওপরে। কিন্তু কোনো বাড়ি ভাঙেনি। একটা পাথর-ভর্তি লরি দাঁড় করান ছিল রাস্তার পাশে। সেটা ৯

তোমরা কি জানো যে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে হাতিই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ? কিংবা তোমরা কি খবর রাখো যে, প্লোভার পাখিরা গোটা শীতকাল কাটায় হাওয়াই দ্বীপে ? শুধু হাতি কিংবা পাখি বলে কথা নেই, অজস্র রকমের পশুপাখি ও সরীসৃপ সম্পর্কে বেরিয়েছে

দারুণ মজার বই

জীবজন্তুর নানাকথা

শ্রীধীরানন্দ দাশগুপ্ত

এ–বই পড়লে বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি অসংখ্য পশু ও নানা জাতের পাখি সম্পর্কে মজার-মজার সব খবর পেয়ে যাবে ও সেইসব খবর শুনিয়ে বন্ধুবান্ধবদের তাক লাগিয়ে দিতে পারবে। পাতায়-পাতায় সুন্দর ছবি। বিরাট বই। দাম কত জানো ?

মাত্র বারো টাকা

কী জানতে চাও

মহাকাশ থেকে এই পৃথিবী, যেদিকে তাকাও যা-কিছু দেখো, এবং সে সম্পর্কে যত প্রশ্ন জাগে তোমার মনে, তার উত্তর এই একটি মাত্র বইয়ের মধ্যে ধরা রয়েছে।

ছোটদের বিশ্বকোষ

বাংলায় এর চেয়ে ভাল 'বুক অব নলেজ' আর কখনও হয়নি। তার কারণ, যিনি যে-বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিত, সেই বিষয়ে তাঁকে দিয়ে এখানে উত্তর লেখানো হয়েছে। তার উপরে আবার

পাতায় পাতায় ছবি

সম্পাদক ঃ
অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মোট পাঁচ খণ্ডে এ-বই সম্পূর্ণ হবে। তার মধ্যে চার খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ও পঞ্চম খণ্ডের দাম ১৬৲ টাকা; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের প্রত্যেকটির দাম ১২৲ টাকা।

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কাত হয়ে হেলে আছে একদিকে। সব পাথর এদিক ওদিক ছড়ান।

এরই মধ্যে কিছু লোক জেগে উঠে ভিড় করে আছে ব্রিজের পাশে। তাদের কাছে শুনলাম, হাতির পাল নাকি নদীতে নেমে ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে গেছে বাচ্চাটাকে। আর মূলচাঁদ ? তার খবর ঠিক কেউ জানে না।

শুধু একজন বলল, "মূলচাঁদকেও ধরে নিয়ে গেছে হাতিরা।"

তাই শুনে বুবুন বলল, "চলো নীলু মামা, আমরা ওকে উদ্ধার করে আনি!"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তা তো যেতেই হবে!"

কিন্তু ঝর্নামাসী আর একবেলাও থাকতে চান না সেখানে। কাল রাত্তিরের ঘটনায় তিনি ভয় পেয়ে গেছেন খুব। আবার যদি হাতিরা আসে ?

মূলচাঁদের কথা শুনে ঝর্নামাসী বললেন, "হাতিরা ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে ? বেশ হয়েছে! ও কেন হাতির বাচ্চা চুরি করতে গিয়েছিল ?"

আমাদের চলে যাবার একটুও ইচ্ছে নেই, কিন্তু ঝর্নামাসী রাগারাগি করতে লাগলেন খুব। মেসোমশাই জিপ গাড়িটা বার করলেন। তাতে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, এমন সময় বড় রাস্তায় আবার একটা হৈ হৈ শব্দ উঠল। আমি আর বুবুন ছুটে গেলাম সেখানে। শুনলাম, খোঁজ পাওয়া গেছে মূলচাঁদের। ওপারের জঙ্গলে দুটো গাছের মাথায় নাকি শুয়ে আছে মূলচাঁদ। একটু আগে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে সেই অবস্থায় চ্যাঁচামেচি করছে। নামতে পারছে না।

এর পর তো আর সব ঘটনাটা না-জেনে যাওয়া যায় না। পুলিসের গাড়ি এসে পড়েছিল। তার থেকে ক'জন পুলিস মশ-মাঁশিয়ে চলল ওপারের জঙ্গলে। আমরাও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। তারপর এক জায়গায় দেখলাম অবাক কাণ্ড! পাশাপাশি দুটো বেশ বড় গাছ। তার মধ্যে এক গাছের ডালে মূলচাঁদের মাথা আর অন্য গাছে তার দুটো পা। দুটো গাছের মাঝখানে সে ব্রিজ হয়ে আছে।

মূলচাঁদ নেমে গিয়েছিল নদীতে। সেখান থেকে গাছের ডগায় এল কী করে ? সে "বাঁচাও বাঁচাও" বলে চিৎকার করছে। আর নীচ থেকে সবাই বলছে, এই চেঁচিয়ো না, পড়ে যাবে!

বুবুন হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, "এই, হাসতে নেই! একটা লোক বিপদে পড়েছে.....।"

কিন্তু বুবুনের হাসি শুনে অন্য সবাইও হেসে উঠল হো হো করে।

মূলচাঁদকে শেষ পর্যন্ত গাছ থেকে ঠিকঠাক নামিয়ে আনা হল অবশ্য। সে নেমেই বলল, "ও বাবারে, খুব বেঁচে গেছি। আর আমি হাতি ধরার কাজ করব না। আর এ জায়গাতেই থাকব না! একটা হাতি আমাকে জলের মধ্যে ধরে ফেলে শুঁড়ে তুলে যখন নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ভাবলাম বুঝি আছাড় দিয়ে মেরেই ফেলবে!"

একজন পুলিস বলল, "এবারের মতন হাতিরা একটু ঠাট্টা করে গেছে মূলচাঁদের সঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গে একজন জংলী লোক বলল, "হ্যাঁ স্যার! হাতিরা যখন ফিরে যায়, আমি তখন শুনেছিলাম তারা খুব হাসছে। হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে!"

তাই শুনে পুলিসরাও এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে লাগল!

ছবি সুধীর মৈত্র

রাজকাহিনী

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তেজপাতার কাঁচা পাতা
এলাচ গাছের বন
খয়ের গাছের খোঁটায় বাংলো
দাঁড়িয়েছে কেমন!

চা গাছের চাব্‌ড়া মাথা
বিরোৎ পাহাড় জুড়ে
সিঁড়ির মতন সবুজ সিঁড়ি
ঠিক্‌রোচ্ছে রোদ্দুরে।

কোয়াশ ফলে বাগানভর্তি
টোপরফুলে মউ
দুই টম্যাটো গালের কন্যে
হবেন রাজার বউ।

রাজার অনেক ভাঙা আরশি
খেলনাদেশের ঘর
পাহাড়চুড়োয় শতেক গুম্ফা
রঙিন ছিটকাপড়।

রাজা সেজে এসেছেন
অনেকদিনের পরে রাজা
ভালোবেসেছেন
রাজা সেজে এসেছেন
রডোডেনড্রন পরে রাজা
নাচ্‌তে লেগেছেন।

তেজপাতার কাঁচা পাতা
এলাচ গাছের বন
খয়ের গাছের চতুর্দোলায়
মানিয়েছে কেমন—
রাজায় মানিয়েছে কেমন!

ছবি সুনীল শীল

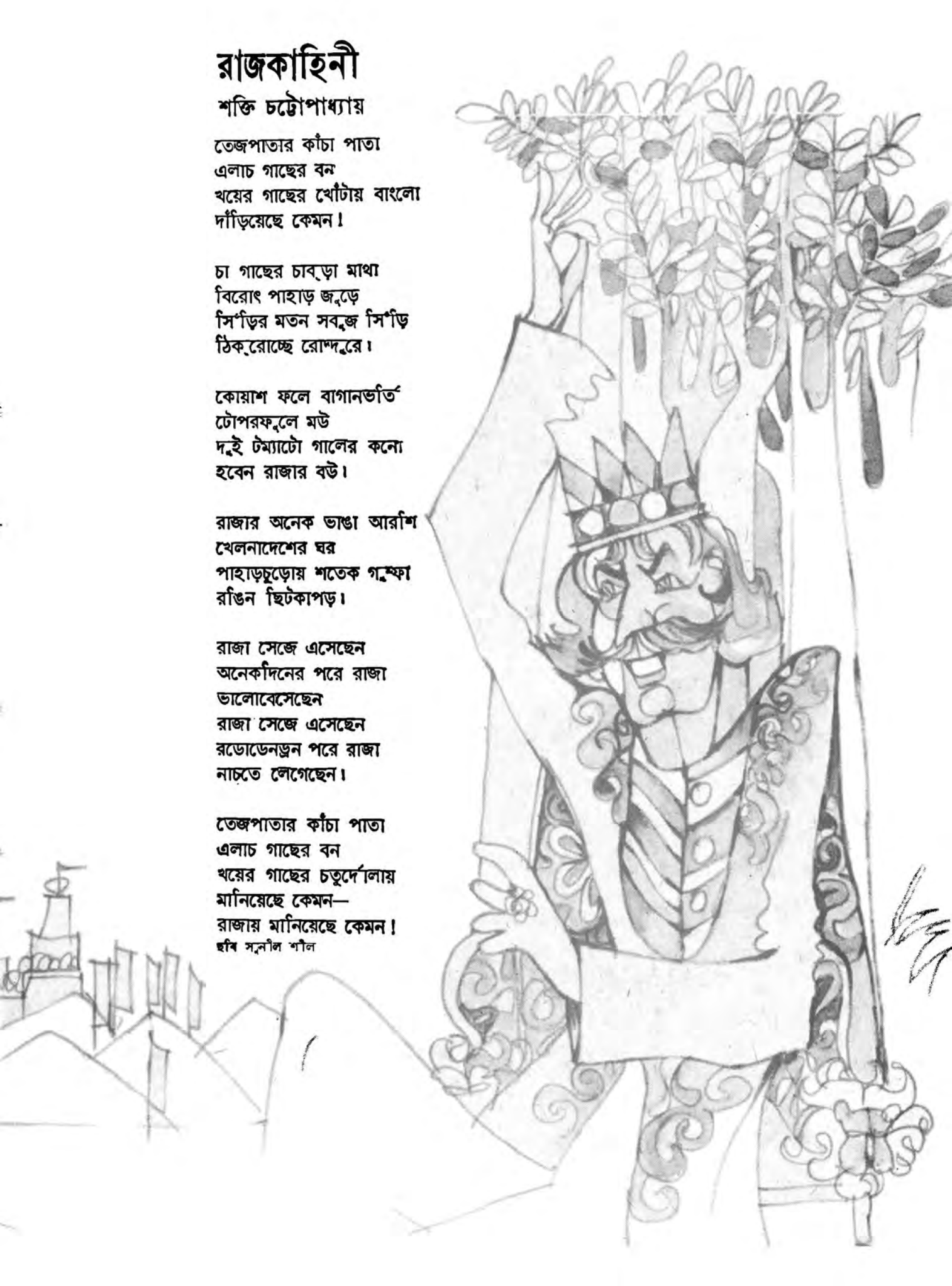

ভুতুড়ে গাড়ি

এদিকে হক তো তার মতলব হাসিল করে যাহ্যাদে আটখানা...
বুড়ির যাবতীয় আসবাবপত্তর তো সরিয়ে ফেলেছি। দেখি, এবার কেমন বাজি না হয়।
ইতিমধ্যে হার্বি আবার চলতে শুরু করেছে...
ওকে নিজের মত চলতে দাও। ও সিধে আমাদের লুকোনো চোরাই জিনিস্ পত্তরগুলোর দিকে নিয়ে যাবে...
53
শিকারী কুকুরের মত হার্বি মিসেস্ স্টেইনমেৎসকে নিয়ে হাজির হল চোরাই মালের আস্তানায়...
কিন্তু ভেতরে ঢুকব কী করে?
ALONZO HAWK VAN AND STORAGE
আর তর সয় না হার্বির!
দমা!!
গুদামের ভেতরে...এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায় হার্বি...
ঐ যে ক্যাপ্টেনের ছবি! ওগুলোই আমার জিনিস!
পুরনো এক মালগাড়িতে বোঝাই করা হল চোরাই জিনিসপত্রগুলো...
6-30
মিসেস স্টেইনমেৎসের বাড়িতে...হার্বি টেনে নিয়ে এল গাড়িটাকে...
পরদিন সকালে...

'খবরের কাগজের খবরটা ঠিকই'—মিসেস্ স্টেইনমেৎসকে জানালেন মিঃ হক্....
বাড়িটা বাঁচাবার জন্যে আপনি যা করেছেন তা সত্যিই তারিফ করার মতো। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না।
অশেষ দয়া আপনার!

পরে আমি স্রেফ্ বলে দেব যে, খবরের কাগজে ভুল খবর বেরিয়েছে। আরে বাবা, এটা হল আমার হাজারটা চালের মধ্যে একটা!

সন্ধেবেলা নিকোলে আর উইলোবি গেছে বেড়াতে...হক্‌কে হারানোর আনন্দে মিসেস স্টেইনমেৎস বাড়িতে বসে খোশ্‌মেজাজে সন্ধেটা কাটাচ্ছেন এক বন্ধুর সঙ্গে...
আরে! তুমি তো দারুণ সব আয়োজন করেছ!

হঠাৎ দুদ্দাড় শব্দে থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে পুরনো বাড়িটা
?
!

ভয়ংকর সব রক্তদানবদের ধেয়ে আসতে দেখে ঘাবড়ে যায় হার্বি!
53
7-7

মিসেস স্টেইনমেৎস্! আমরা চারদিক থেকে আপনাকে ঘিরে ফেলেছি।

দশ মিনিট সময় দিচ্ছি...এর মধ্যে মালপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে কেটে পড়ুন! তারপর আপনার এই সাধের বাড়িটা আমি ধুলোয় মিশিয়ে দেব!
এরপর আগামী সংখ্যায়

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ৪ ॥

বলাইদা আমাকে যখন কোচিং দিতে শুরু করেন তখনো আমি হাইট মাপের ফুটবলে খেলে চলেছি। একদিন তিনটি ফাইনাল খেলে তিনটিতেই জিতেছিলাম। একটিতে খেলেছিলাম পুরো সময় বাকি দুটিতে হাফটাইম অব্দি। ঠিক ছিল, দুটি ফাইনালে খেলব। কিন্তু তিনটিতে খেলতে হল আমাদের স্কুলের গেম-টিচার শিবদাস ব্যানার্জীর অনুরোধে।

আমি পড়তাম বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইন্‌স্টিটিউশনে। শিবদাস ব্যানার্জী শুধু স্কুলের গেম-টিচারই ছিলেন না, বাড়িতেও আমাকে এবং দাদাকে পড়াতেন। খেলাধুলোর সঙ্গে নানা-ভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথম জীবনে ছিলেন কালীঘাট চৈতালী সঙ্ঘের পরিচালক। পরবর্তী জীবনে ভবানীপুর ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক হয়েছিলেন এবং স্কুলের কাজের সঙ্গেই ক্রীড়া সাংবাদিকের বৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন। পরে হয়েছিলেন 'বসুমতী' পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক। আজ তিনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর অবস্থার কথা মনে পড়লে চোখ ফেটে জল আসে। আমাদের বড় ভালবাসতেন। খেলাধুলোয় যাতে উন্নতি করতে পারি, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজেও ছিলেন খেলা-পাগল মানুষ। আমাদের স্কুল-জীবনে বলাইদার মত তিনি ছিলেন অন্যতম শুভানুধ্যায়ী ও অভিভাবকের মত।

পাড়ার গন্ডি পেরিয়ে বলাইদার সঙ্গে যেদিন প্রথম ময়দানে প্র্যাকটিস করতে গেলাম, সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। গড়ের মাঠে অবশ্য আগেও গিয়েছি বেড়াতে। কিন্তু গড়ের মাঠ যেখানে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের তাঁবু—যে তাঁবুর মধ্যে খেলোয়াড়রা জামা-কাপড় ছেড়ে প্যান্ট জার্সি পরে, যে মাঠে তারা খেলে, প্র্যাকটিস করে—সেই মাঠে আমি প্র্যাকটিস করব, এ-কথা কি কোনদিন কল্পনা করতে পেরেছিলাম? কী যে আনন্দ হয়েছিল সেদিন, আজ তা লিখে বোঝাতে পারব না।

একটা কথা তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি। তোমরা কি কেউ কোনদিন ভোরের ময়দান দেখেছ? দেখেছ কি নির্জন প্রান্তরের মায়াময় রূপ? একদিন গিয়ে দেখো কত ভাল লাগবে। মন কত খুশি হবে যখন দেখবে, ভোরের আবছা আলো ক্রমে স্বচ্ছ হচ্ছে—শহরের বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে সূর্য উঠে সোনা-রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে সবুজ ঘাসের ওপর।

আমার বাবাকে বলাইদা ওই কথাই বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "চুনীর ওই তো লিকলিকে শরীর। ভোরের ময়দানের খোলা হাওয়ায় শরীর ভাল হয়ে যাবে, পড়াশুনোয় ফূর্তি আসবে। আর ফুটবল প্র্যাকটিস তো আমিই করাব।"

একটা সমস্যা দেখা দিল রোজ গড়ের মাঠে যাতায়াতের খরচ নিয়ে। আমি আগেই বলেছি, সংসারে বাবার দায়দায়িত্ব ছিল অনেক। ঠাকুমার গঙ্গাস্নানের জন্যও রোজ ট্রামের যাতায়াতের ভাড়া জোগাতে হত। আমার জন্য সেটা ডবল হয়ে গেল। যেদিন দাদা যেত সেদিন হত তিনগুণ।

অবস্থা বুঝে বলাইদা করলেন কী জান? তাঁর 'সার্ভেন্ট' পাসখানা আমাকে দিলেন। ট্রামের পাস। বলাইদা ছিলেন ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানির ওয়েলফেয়ার অফিসার। সার্ভেন্টের জন্য পাস পেতেন। ভোর চারটেয় ঘুম থেকে উঠে আমি ও ঠাকুমা চারটে পঁচিশে বালিগঞ্জের প্রথম ট্রাম ধরতাম। ঠাকুমাকে নামিয়ে দিতাম কালীঘাট মন্দিরের রাস্তায়, আমি চলে যেতাম ময়দানে প্র্যাকটিস করতে। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক আদি গঙ্গায় ভোরে স্নান করা ছিল ঠাকুমার নিত্যকর্ম। তারপর পূজা-আহ্নিক।

রোজ দিনের প্রথম ট্রাম ধরতাম বলে কয়েকদিনের মধ্যে ট্রাম কন্ডাক্টররা আমাকে চিনে ফেলেছিলেন। একদিন হল কী ট্রামের বুড়োমত এক অবাঙালী ইন্সপেক্টর আমার 'পাস' চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। 'সার্ভেন্ট পাস'খানা তাঁর হাতে দিতেই নামধাম পড়ে নিলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। ট্রাম প্রায় ফাঁকা। সেদিন ঠাকুমাও আমার সঙ্গে ছিলেন না। ইন্সপেক্টর বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে, হিন্দি ও বাংলা মিশিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে বলাইবাবুর বাড়িতে চাকর খাটছি। "তোমার তো পড়াশুনো করার সময়। মনে হচ্ছে, বহুত ভদ্র আদমীর লেড়কা। একেবারে বাচ্চা ছেলে। বাড়ি থেকে কি গোঁসা করে পালিয়ে এসেছ?" ইন্সপেক্টরের এ-কথার কী উত্তর দেব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারছিলাম না যে, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে আসিনি। উল্টে তিনিই আমাকে বোঝাচ্ছিলেন, "গোঁসা করতে নেই, পড়ালিখা না করলে, অন্যায় কাজ করলে মা-বাবা তো রাগ করেই থাকেন।" তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি বলাইবাবুকে বলব তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে।" আমি জোর দিয়ে বললুম, "না না, আমি রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসিনি, আমি লেখাপড়াও করি, আবার বলাইবাবুর কাজও করি।" ইন্সপেক্টর তখন 'সার্ভেন্ট পাস'খানা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে 'বেশ বেশ' বলে ট্রাম থেকে নেমে গেলেন।

'বলাইবাবুর কাজ করি'—এই মিথ্যে কথাটা বলায় মনটা খচ-

খচ করছিল। সেদিনই ঘটনাটা বলাইদাকে বললাম। তিনি প্রথমে হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "তুমি তো মিথ্যে বলনি। আমার কাজই তো করছ। আমি চাই তুমি খেলায় অনেক বড় হবে। নাম করবে। আমার মান রাখবে।"

প্র্যাকটিসে আমি কোনদিন কামাই দিইনি। ঠাকুমার যেমন ধর্ম ছিল গঙ্গাস্নান, আমার তেমন ধর্ম হয়ে উঠল রোজ ভোরে ফুটবল প্র্যাকটিস। ঠাকুমাকে সঙ্গী পেয়ে একটা সুবিধাও হয়েছিল। ছোটবেলায় আমি ছিলাম খুব ঘুম-কাতুরে। ঠাকুমাই ভোর চারটেয় আমাকে ডেকে তুলতেন। কোনদিন আলসেমি করে বিছানায় শুয়ে থাকলে তাঁর সে কী তাড়া! "রাজ্যের লোক উঠে পড়ল, তুই এখনো শুয়ে আছিস? কখন মাঠে যাবি? ফিরে এসে স্কুলে যেতে হবে না?" এইভাবে বকবক করতেন। আস্তে আস্তে ভোরে ওঠা আমার অভ্যাস হয়ে গেল। 'আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ' কথাটি আমার জীবনে সত্য হয়ে দাঁড়াল। এখন নানা কাজের চাপে সবদিন সকাল-সকাল ঘুমুতে যাওয়া হয়তো সম্ভব হয় না, কিন্তু খুব ভোরে বিছানা থেকে ওঠার অভ্যাস এখনো বজায় রেখেছি। শুধু ভোরে ওঠাই নয়, একটুআধটু ছোটাছুটিও করি। তাতে শরীর-মন ভাল থাকে। সারাক্ষণ কাজের প্রেরণা পাই।

যখনকার কথা লিখছি, তখন আমার বয়স দশ-এগারো। ঠাকুমার পঁয়ষট্টি। কোন-কোনদিন এমনও দেখা গেছে, ট্রামে যাত্রী মাত্র দুজন। একজন এক পুণ্যার্থী বৃদ্ধা, আর অন্যজন এক ফুটবল শিক্ষার্থী বালক। স্রেফ এই দুজনকে নিয়ে ভোরের বাতাস চিরে হুহু করে ট্রাম ছুটেছে।

ফুটবল খেলায় আমার যখন একটু নাম হল, তখন আমাকে নিয়ে ঠাকুমার কত গর্ব। কোন-কোন জায়গায় আগ বাড়িয়ে বলতেন, "এই আমার নাতি চুনী। ওই যে বড়-ক্লাবে ফুটবল খেলে। কাগজে ছবি বের হয়। দেখনি?" আমিই অনেক সময় লজ্জায় পড়ে যেতাম।

ঠাকুমা মারা গেছেন ১৯৭১ সালে ৮৮ বছর বয়সে। তাঁর কথা লিখতে গিয়ে আজ মনে হচ্ছে, আমি যেন তাঁর সেই স্নেহের সাগরে সাঁতার কাটছি। আমাদের স্কুল কলেজে পরীক্ষার সময় তো বটেই, খেলার দিন ঠাকুর-ঘরে ঢুকে নারায়ণকে নিবেদিত তুলসীপাতা নিয়ে এসে আমাদের মাথায় বুকে ছুঁইয়ে পকেটে পুরে দিতেন। মুখে বলতেন, "মধুসূদন মধুসূদন।" ঠাকুমার ধর্ম-বিশ্বাসে আমাদেরও বিশ্বাস বেড়ে যেত। মনে জোর পেতাম। খেলার সময়ও জার্সির পকেটে রাখতাম তুলসী-পাতা।

শেষ জীবনে ঠাকুমা চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। তবু অভ্যাসের বশে এবং অনুমান-শক্তিতে নির্ভর করে একা একা গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। আমরা যখন যোধপুর পার্কের বাড়িতে গিয়েছি তখনো। প্রায়ই পথ ভুল হত। অন্য স্টপে নেমে পড়তেন। ভুল-বাসেও চড়ে বসতেন কোন-কোনদিন। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসতেন ঠিকই, দু-তিনটি ছেলের সঙ্গে। পথ হারিয়ে রাস্তার ছেলেদের বলতেন, "বাবারা, আমি চুনীর ঠাকুমা। আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দেবে?"

"কোন্ চুনী?"

"ওই যে, ফুটবল খেলে। চুনী গোস্বামী গো। আমার নাতি।"

আর বলতে হত না। ছেলেরা বলত "আপনি তো আমাদেরও ঠাকুমা।" ওরাই ঠাকুমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত। কোনদিন রিকশায়। কোনদিন বা ট্যাক্সি করে।

বাবা একদিন রসিকতা করে ঠাকুমাকে বললেন, "মা, তোমার

বাবা

ঠাকুমা

বয়স যখন নিতান্ত অল্প, মেডেল-কাপ-শীল্ড তখনও এসেছে প্রচুর

আশুতোষ কলেজ টীমের সঙ্গে চুনী (দাঁড়িয়ে, ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)

নাতির সংখ্যা যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।"

"তা বাড়ুক। ওরা আমাকে চুনী-মানিকের মতই ভক্তিশ্রদ্ধা করে। কত খাতির করে বাড়ি পৌঁছে দেয় জানিস?"

বাবা আর কথা বলেননি। শুধু একটু হেসেছিলেন।

একদিন হল কী, ঠাকুমা ট্রাম-স্টপে নামতেই দুটি ছেলে তাঁকে আদর করে পাশের দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে তুলল। ট্যাক্সি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বলল, চলুন ঠাকুমা, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। ঠাকুমার আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কাউকে সন্দেহ করতেন না। ট্যাক্সিতে চেপেই তারা (তোমরা হয়তো ভাবছ রাহাজানি-টানি কিছু; না, তা নয়) আবদার জানাল, ১৫

হনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি খেলার দুখানা টিকিট দিতে বে। বলল, "চুনীদার কাছ থেকে নিয়ে আমাদের দিতেই হবে কুমা। টাকা আপনার কাছে দিয়ে রাখছি।"

আমি কিছুই জানতাম না। খেলার তিন-চার দিন আগের ঘটনা এটা। টিকিটের দাবিদার ছিল প্রচুর। যাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম খেলার দিন সকালে বাড়িতে তাঁদের যখন টিকিট দিচ্ছি, ঠাকুমা তাঁর জপের মালার থলি থেকে টাকা বের করে বললেন, "আমাকে দুখানা দে।" আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মা ব্যাপারটা জানতেন। তবু রসিকতা করে বললেন "তোর ঠাকুমা তাঁর স্নানের ঘাটের এক সইকে নিয়ে আজ তোর খেলা দেখতে যাবেন।"

সেদিন ঠাকুমাকে দুখানা টিকিট দিতে হয়েছিল। তাঁর পাতানো এই সব নাতিরা পরেও দু-একবার আমাদের বরাদ্দ টিকিটে ভাগ বসিয়েছে। তবে সংখ্যায় বেশি নয়। ঠাকুমা পরে ব্যাপার দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, বড় খেলার টিকিট দেওয়া কত শক্ত। কেউ চাইলে বলতেন, "বেশি টিকিট পাবে কোথায় বল্? লঙ্কার লোক চুনীকে ছেঁকে ধরেছে। তোমরা দাদারা রাগ কোরো না।"

অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা, ভীষণ সরল এবং স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন ঠাকুমা। আমার জন্যই বুড়ো বয়সে ফুটবলকে ভালবেসেছিলেন। কেউ যদি বলত, আজ চুনী ভাল খেলেনি তিনি বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, "হতেই পারে না। আমি ঠাকুরকে কত ডেকেছি। চুনী কিছুতেই খারাপ খেলতে পারে না।" এমন ঠাকুমা পাওয়া ভাগ্যের কথা। সত্যিই আমি ভাগ্যবান।

আমার জীবনের একটা অবাক হবার মত ঘটনার কথা বলছি তোমাদের। খবরের কাগজের পাতায় জায়গা কম বলে আজকাল তো খেলোয়াড়দের ছবি কম ছাপা হয়। আমরা যখন খেলেছি, তখন কিন্তু প্রচুর ছবি ছাপা হত। বিশেষ করে আনন্দবাজার পত্রিকায়। কাশিমবাজার রাজবাড়ির মাঠে ছোটদের যে ফুটবল খেলা হত, তাঁরও ফাইনাল খেলার ছবি ছাপা হত। সুতরাং আমারও প্রচুর ছবি ছাপা হয়েছে। ফুটবল খেলে প্রচুর প্রাইজ পেয়েছি। স্কুলে ছাত্রও খারাপ ছিলাম না। "শুধু খেলেই বেড়াও, পড়াশুনা করো না"—অন্তত একথা কোনদিন মাস্টারমশাইদের কাছে শুনতে হয়নি। তবু কিন্তু আমি ফুটবলার হিসাবে কলেজে ভরতি হতে পারিনি। আশুতোষ কলেজে ভরতি হয়েছিলাম ক্রিকেটার হিসাবে। এমনিই ভরতি হতে পারতাম। খেলোয়াড় কোটায় ভরতি হবার প্রয়োজন হয়েছিল ফ্রী স্টুডেন্টশিপের জন্য।

কেন ফুটবলার হয়ে ভরতি হতে পারিনি জানো? দেখতে একেবারে বাচ্চা ছিলাম বলে। আমার জন্ম ১৯৩৮ সালের জানুয়ারির ১৫ তারিখে। ১৫ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করি। বয়স অনুপাতে দেখতে আরও ছোট ছিলাম, সে-কথা তো আগেই বলেছি। আশুতোষ কলেজে যাঁরা খেলোয়াড়-কোটায় ছাত্র ভরতি করার কর্তা ছিলেন, আমাকে দেখে তাদের ধারণা হয়েছিল, কলেজ-ছাত্রদের সঙ্গে তাল রেখে আমি ফুটবল খেলতে পারব না। তবে ক্রিকেটে তো ধাক্কাধাক্কির বালাই নেই, তাই ক্রিকেটে হয়তো অসুবিধা হবে না। কিন্তু ক্রিকেটার হিসাবে ভরতি হলাম কী করে? সে আর এক গল্প। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময়ের ঘটনা।

ইন্টারস্কুল ক্রিকেটে আমাদের স্কুলের খেলা ছিল সাউথ সুবার্বন স্কুলের সঙ্গে। মাঠ আমাদের স্কুলেরই সামনে। অর্থাৎ দেশপ্রিয় পার্কে। খেলার দিন স্কুল বসার পরই ছুটি হয়ে গেল। আমরা চলে গেলাম পার্কে। দেখি সাউথ সুবার্বনের ছাত্ররা প্র্যাকটিস করছে। প্যাড গ্লাভস পরে তারা তৈরি। কিন্তু আমাদের দল তখনো মাঠে আসেনি। শুনলাম স্কুলের গেম্‌স রুমে সবাই রয়েছে। ট্রাম লাইন পার হয়ে এক দৌড়ে ছুটে গেলাম স্কুলে। গিয়ে দেখি সেখানে আমাদের গেম-টিচার এবং ক্যাপ্টেন মুখ ভার করে বসে আছেন। কারণ কয়েকজন খেলোয়াড় তখনো আসেনি।

ক্যাপ্টেন কে ছিলেন, জানো? বুদ্ধদেব গুহ। মাসিক আনন্দমেলার পাতায় তাঁর গল্প তোমরা অনেক পড়েছ। মস্ত বড় সাহিত্যিক। এ বছরই তো আনন্দ পুরস্কার পেলেন। বুদ্ধ ছিল আমার সহপাঠী। ছেলেবেলায় ক্রিকেটের দক্ষতা ও ঝোঁক দু-ই ছিল। আমার দুঃখ, বুদ্ধ এত বই লিখল, কিন্তু ক্রিকেট নিয়ে সাহিত্য রচনা করল না। বেশ ভাল খেলত। বুদ্ধকে বললাম, "আমাকে দিয়ে চলবে?" বুদ্ধ একটু তামাশা করেই বলল, "এটা তোর ফুটবল খেলা নয়—ক্রিকেট খেলা।"

সত্যি কথাই। আমি তো কোনদিন ক্রিকেট খেলিনি। একেবারে খেলিনি বললে ভুল হবে। খেলেছি পাড়ার রাস্তায়, ক্যাম্বিস বলে, তক্তার ব্যাটে এবং ইঁট সাজিয়ে তৈরি উইকেটে। কিন্তু স্টাম্প-পোঁতা মাঠে কোনদিনও না। সুতরাং আনাড়ি একজনকে দলে নেবার প্রশ্নে অধিনায়ক বুদ্ধর মন মোটেই সায় দেয়নি। শেষ-পর্যন্ত কিন্তু আমাকে নিতে হয়েছিল একাদশ স্থান তখনো শূন্য থাকায়। শিবদাসবাবু বলেছিলেন, "চুনী যখন ফুটবল ভাল খেলে, তখন কোনভাবে চালিয়ে দিতে পারবে। অন্তত ফিল্ডিং নিশ্চয় খারাপ করবে না।"

আমি কিন্তু বুদ্ধকে মোটেই ডোবাইনি। আমার জীবনের প্রথম ক্রিকেট খেলা বলে রানটা এবং উইকেটের সংখ্যা এখনো মনে আছে। ৪৭ রান করেছিলাম, আর শূন্য রানে পেয়েছিলাম

শিক্ষাজগৎ ও সরকার

- পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকার চান প্রত্যেকটি স্কুলে ভালোভাবে লেখাপড়া চলুক,—সকল বিশৃঙ্খলা দূরে থাক।
- পরীক্ষায় টোকাটুকি বন্ধ হোক।
- প্রত্যেকটি স্কুলে শৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে, ভালোভাবে পড়াশোনা চলে, সেজন্য প্রত্যেকটি ছাত্রকেই নজর দিতে হবে।
- নিরক্ষরতা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপ—দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতেই হবে।
- শিক্ষাজগৎকে দুর্নীতিমুক্ত করে শিক্ষার প্রসারে সকলের সহযোগিতাই সরকারের কাম্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চারটি উইকেট। খেলায় আমরা জিতেছিলাম অতি সহজে। খেলার পর বুদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বন্ধু তো আগেও ছিল। সেইদিন থেকে বুদ্ধর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আরও নিবিড় হল। ক্রিকেটেও আমার অভিষেক হয়ে গেল। শিবদাসবাবু বললেন, "তোমাকে আমি বেঙ্গল স্কুলের নেট প্র্যাকটিসে পাঠাব।"

আমি যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়ে ফুটবলের সঙ্গে ক্রিকেটও শুরু করলাম। ওই দেশপ্রিয় পার্কেই। ইতিমধ্যে সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেড্‌স জুতো জোগাড় হয়ে গেছে। একদিন নেট প্র্যাকটিসের জন্য সত্যি সত্যি ডাক পড়ল স্পোর্টিং ইউনিয়ন মাঠে। কোচবিহার ট্রফিতে বিহার স্কুলের বিরুদ্ধে বাংলা স্কুলের দল গড়ার নেট প্র্যাকটিস।

ময়লা কেডস জুতো সাবান দিয়ে ধুয়ে, চকখড়ি ঘষে ঘষে রোদে দিলাম। দুধের মত সাদা কেডস, পাটভাঙা সাদা প্যান্ট-শার্ট পরে তো মাঠে গেলাম। ভয়ে কিন্তু বুক ঢিপঢিপ করছিল। যদি ভাল কিছু না-করতে পারি, নির্বাচকেরা বাতিল করে দেবেন। প্রধান নির্বাচক দুজন সাহেব। তাতে আরও ভয় পেয়েছিলাম। ছেলেও কম নয়। আশি জনের মতো। বহু স্কুলের গেম-টিচার এবং ছেলেদের দাদারাও সেখানে উপস্থিত। কয়েকটি ছেলের আবার বেশ বড় বড় দাড়ি-গোঁফ। তাদের তুলনায় আমি একেবারে লিলিপুট। ভাবছিলাম, আমাকে নজরে পড়বে তো? এত সেজেগুজে এলাম, ডাকবে তো?

প্র্যাকটিস শুরু হয়ে গেল। সত্যিই দুজন সাহেব ডেকে ডেকে কাউকে ব্যাট করতে, কাউকে বল করতে বলছিলেন। সাহেবদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কদমছাঁট চুলের বেঁটে এক বাঙালী ভদ্রলোক। অবশ্য প্যান্ট-কোট-পরা। তাঁর সঙ্গেই সাহেবরা আলোচনা করছিলেন—কে কেমন ব্যাট করছে, কে কেমন বল করছে। আমার আর ডাক পড়ে না। হতাশ হয়ে বসে আছি। বেলা গড়িয়ে বিকেল হল। ভাবলাম আজ আর ডাকবে না। মিছেমিছি প্যান্ট-শার্টের ভাঁজ ভাঙলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে একজন সাহেব ডাকলেন আমাকে। ভয়ে-ভয়ে কাছে যেতেই ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করো? ইউ ব্যাট?" বললাম, "ইয়েস স্যার।" তারপর একটু থেমে বললাম, "অ্যান্ড আই বোল টুউ—লেগ-ব্রেক।"

"ওঃ, লেগ স্পিনার? রিয়েলি?"

তারপর আমার দিকে একটা বল ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "গো অ্যান্ড বোল।"

দু ওভার বোলিং দেখে তিনি আমাকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন এবং দলেও নিয়েছিলেন।

কে দলে নিয়েছিলেন জানো? ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট কোচ বার্ট ওয়েন্সলি, যাঁর কাছে খেলা শিখে বহু ক্রিকেটার বড় হয়েছেন, তখন ছিলেন ভারতে। স্কুল ক্রিকেটারদের কোচিংয়ের ভারপ্রাপ্ত। ওয়েন্সলির সঙ্গে আর যে গোরা ভদ্রলোক নেট প্র্যাকটিস দেখছিলেন, তাঁর নাম তোমরা জানো। বিখ্যাত বেতার ভাষ্যকার পিয়ার্সন সুরিটা। তখন ছিলেন সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান। ও'দের পাশে দাঁড়ানো যে বাঙালীর কথা বলেছি, তাঁর নাম সন্তোষ গাঙ্গুলী। অতীতের ক্রিকেট ও হকি খেলোয়াড়, ক্রিকেট আম্পায়ার এবং ক্রীড়া-সাংবাদিক। তখন ছিলেন সিলেকশন কমিটির সদস্য।

বার্ট ওয়েন্সলি আমার বোলিং দেখে একটা নাম দিয়ে বসলেন—'টিচ'। টিচ ফ্রিম্যান ছিলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেগ-ব্রেক বোলার। ওয়েন্সলি নেট প্র্যাকটিসের সময় মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে বলতেন, "কাম অন টিচ—বোল।" তাঁর সঙ্গে পিয়ার্সন সুরিটাও আমাকে 'টিচ' বলে ডাকতেন। এখনো ওই নামেই ডাকেন। সুরিটার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছে অনেক পরে।

নেট প্র্যাকটিসের সময় নির্ভুলভাবে ব্যাট ধরা, স্টান্স নেওয়া, ব্যাট চালানো, ব্যাক লিফট, ফলো থ্রু বল করা প্রভৃতি ক্রিকেট খেলার নানা কৌশল কতগুলি জ্যামিতিক সূত্রের মাধ্যমে ও'রাই প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এই যেমন ব্যাটের হ্যাণ্ডেল ধরার সময় অন্য আঙুলের সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের ফরমেশন হবে, এগিয়ে খেলার সময় কত অ্যাঙ্গেলে হাঁটু ভাঙতে হবে, কনুই রাখতে হবে কত অ্যাঙ্গেলে, ক্রিজের সঙ্গে দুই পা কীভাবে প্যারালেল থাকবে ইত্যাদি।

বিহার স্কুল দলের বিরুদ্ধে আমি খুব ভাল কিছু করতে পারিনি। কত রান করেছিলাম, কটি উইকেট নিয়েছিলাম, আজ ঠিক মনেও করতে পারছি না। বোম্বাই স্কুল দলের বিরুদ্ধে আরও কম রান করেছিলাম। কিন্তু খেলাটি ইডেনে হয়েছিল বলে ঘটনাগুলি মনের উপর দাগ কেটে রেখেছে। ইডেনে সেই আমার প্রথম ক্রিকেট খেলা। সে আর-এক অনুভূতি। যে মাঠে রাজা-মহারাজারা ক্রিকেট খেলেছেন, খেলেছেন পৃথিবীর সব জাঁদরেল ক্রিকেটাররা, যে-মাঠের মাটি ক্রিকেটারদের কাছে পবিত্র বস্তু, যে-মাঠের ঘাসে ঘাসে ক্রিকেটের গন্ধ, সেই মাঠে আমি খেলব—স্বপ্নেও একথা কোনদিন ভাবিনি। তখন ইডেন মাঠের দৃশ্যও ছিল কত সুন্দর। গোল মাঠের সবদিকে ছিল আকাশে-মাথা-ঠেকানো বিরাট বিরাট ঝাউগাছের সারি। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। মাঝখানে যেন সবুজ গালিচা পাতা। ঝাউগাছগুলি এখন আর নেই। তাদেরই জায়গায় ইট কাঠ লোহা সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়েছে স্টেডিয়াম। এরও অবশ্য একটা শোভা আছে। কিন্তু আগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ ছিল আলাদা।

বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে আমি করেছিলাম ২০ রান। উইকেট নিয়েছিলাম দুটি। আর দিনের প্রথম বলেই একটি ক্যাচ নিয়েছিলাম স্লিপে দাঁড়িয়ে। অপর স্লিপ ফিল্ডার ছিল কল্যাণ মিত্র। তখনই প্রায় ছ ফুট লম্বা। ক্যাচটি কল্যাণের দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু ফুটবল খেলার অভ্যাসেই আমার পা এগিয়ে গেল। ওয়াই এম শেখের ব্যাট ছুঁয়ে বলটি পেছনে আসতেই ক্যাচটি ধরে ফেললাম। অবশ্য ওই ম্যাচেই আমি একটি সহজ ক্যাচ মিস করেছিলাম—ক্রিকেটের ভাষায় যাকে বলে 'ডলি ক্যাচ'। তখন ফিল্ডিং করেছিলাম মিড উইকেটে। উঁচু সহজ ক্যাচটি দৌড়ে ধরতে গিয়ে পা পিছলে আলুর দম। বলটি হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারলাম না। খেলেছিলাম কেডস পরে। তখন ক্রিকেটবুট পাব কোথায়? পরে বুঝেছি ক্রিকেট খেলতে হলে স্টাড-লাগানো বুটের কত প্রয়োজন।

যাই হোক, ওই ক্রিকেট খেলার সুবাদেই খেলোয়াড় কোটায় আশুতোষ কলেজে আমি ভরতি হয়েছিলাম আই এসসি-তে, ১৯৫২ সালে। তখন ম্যাট্রিকের পর পড়তে হত আই এ বা আই এসসি। তারপর বি এ বা বি এসসি। কলেজে ফ্রী স্টুডেন্টশিপও পেয়েছিলাম। ফুল ফ্রী নয়। হাফ ফ্রী।

তখন আশুতোষ কলেজের গেমস সেক্রেটারি ছিলেন দাদার বন্ধু রামানুজ রায়, এখন যিনি বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। রামানুজ রায় তখনকার নামকরা কেমিস্ট ও ড্রাগিস্ট 'রাইমার' বাড়ির ছেলে। বলতেন, 'ক্রিকেট হচ্ছে স্টাইলের খেলা। রান করা অবশ্যই বড় কথা, কিন্তু কীভাবে রান করবে তাই দিয়ে হবে ক্রিকেটারের বিচার। খুব ভাল করে খেলবে। স্যার খুশি হবেন।' স্যার মানে তখন কলেজের খেলাধুলোর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নীরদ ভট্টাচার্য, পরে তিনি আশুতোষ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

উপন্যাস

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

সমরেশ বসু

আগে যা ঘটেছে

গোগোল গতকাল বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে, সেভেনথ্ ফ্লোরের ডাবুদার হারিয়ে যাবার খবর শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ডাবুদা ক্লাস এইটে পড়ে। খবরটা শুনে গোগোলের কিছুই করার ছিল না, ওর বন্ধু টুকাই জর্জ সুমিত পারভেজ গোগেদের সঙ্গে নানারকম আলোচনা করা ছাড়া। গোগোল বন্ধুদের কাছে নীচে নেমে আসার আগেই ডাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে একটা খবর নিয়ে এসেছিল। সেখানে ফিফ্‌থ ফ্লোরের হনুমন্তিয়াজী বলেছিলেন ডাবুকে হয়তো কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, এবার ডাবুদার বড়লোক বাবার কাছে অনেক টাকার মুক্তিপণ দাবি করবে। এইসব আলোচনার ফাঁকেই, গোগোল সিক্সথ্ ফ্লোরের মহেশানিদের বন্ধ-দরজা ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে মানুষের চুপিচুপি স্বর আর নানানরকম শব্দ শুনতে পায়। মহেশানিরা সবাই দিল্লি চলে গিয়েছেন। কেবল কাজের লোক চান্দা সিং ছাড়া। গোগোলের কাছে ফ্ল্যাটের ভিতরের শব্দগুলো কেমন রহস্যময় মনে হয়। ইয়েল লকের ছিদ্রে চোখ লাগিয়ে অন্ধকার পর্দা ছাড়া প্রথমে কিছুই দেখতে পায়নি। আর একটা অচেনা লোককে গোগোল বিল্ডিংয়ের মধ্যে কয়েকবার ওঠানামা করতে দেখতে পায়। ডোরাকাটা শার্ট, কালো ট্রাউজার, গোফওয়ালা লোকটাকে অনেকটা ড্রাইভারের মতো দেখতে। এ সবের সঙ্গে ডাবুদার হারিয়ে যাবার কোন যোগাযোগই থাকতে পারে না, তবু লোকটা গোগোলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর লোকটাকে দেখা গিয়েছিল মহেশানিদের সিক্সথ্ ফ্লোরের বন্ধ দরজার সামনেই। সে নাকি চান্দা সিংয়ের মামা। চান্দা সিং ভিতরে ছিল কি না, কে জানে। কলিং বেলের সুইচটাও অফ্ করা ছিল। দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। আশ্চর্য, গোগোলকে লোকটা বলল, সে সত্যি মোটর ড্রাইভার। আরো আশ্চর্য, চান্দা সিং যদি ফ্ল্যাটের মধ্যে না-ই থাকবে, তবে গোগোল শব্দগুলো শুনল কেমন করে? এমন কী, একবার ছিদ্রের ভিতরে উঁকি দিয়ে ও ভিতরে আবছা আলোও দেখেছিল, আবার তা ঢাকাও পড়ে গিয়েছিল। ওর বন্ধু জর্জ হেসে বলেছে, গোগোল নাকি আজেবাজে সব শব্দ শুনেছে। আজ সকালবেলা হনুমন্তিয়াজী কিন্তু জানালেন, তাঁর কথাই ঠিক। গতকাল রাত্রে নাকি কে টেলিফোন করে ডাবুদার বাবার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করেছে। ডাবুদার মুক্তিপণ হিসাবে। তারপর—

৮

হনুমন্তিয়াজীর কথা শুনে, গোগোলের গলায় যে খানিকটা টুথপেস্টই শুধু চলে গেল, তা নয়। ও এত বড় হাঁ করল, টুথ-ব্রাশটাই পড়ে যাচ্ছিল। গোগোল তাড়াতাড়ি সেটা হাতে লুফে নিল। গোগোলের বাবা-মা'র চোখে-মুখেও রীতিমতো ভয় আর উত্তেজনার ছাপ। তাঁরা দু'জনে হনুমন্তিয়াজীর চেয়ারের দু-পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু হনুমন্তিয়াজী, এ খবরটা আপনি পেলেন কেমন করে?"

হনুমন্তিয়াজী অবাক হয়ে বললেন, "কেমন করে আবার? এরকম যে ঘটতে পারে, তা তো আমিই কাল বিকেলে ডাবুর বাবাকে বলেছিলাম। আজ ভোরবেলা ডাবুর বাবা হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে এসে ডাকাতদের টেলিফোনের কথা বললেন। তাতেই জানতে পারলাম।"

মায়ের যেন একবার শুনে বিশ্বাস হয়নি, তাই জিজ্ঞেস করলেন, "নীহারবাবু কী বললেন?"

ডাবুদার বাবার নাম নীহারবাবু। হনুমন্তিয়াজী বললেন "বললাম তো, ডাকাতরা কাল রাত দুটোর সময় টেলিফোন করে বলেছে, ডাবুকে তারা লুকিয়ে রেখেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেই ছেড়ে দেবে।"

মা বলে উঠলেন, "কিন্তু তারা যে ডাকাত, তা জানা গেল কেমন করে?"

মায়ের কথা শুনে হনুমন্তিয়াজী হেসেই ফেললেন। গোগোলের হাসি না পেলেও, মাকে ওর ছেলেমানুষ মনে হল। এটা তো সবাই বোঝে, ডাকাত ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না। হনুমন্তিয়াজী বললেন, "এর আবার জানাজানির কী আছে? আপনি ডাকাত না বলতে চান, কিডন্যাপার বলতে পারেন। মানে যারা মানুষ চুরি করে। আসলে তো কথাটা একই হল। এটাও তো একরকমের ডাকাতি, মানে রবারি! একটা ছেলেকে লুকিয়ে রেখে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করে। কী সাংঘাতিক!"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু টাকাটা দেওয়া হবে কেমন করে, আর কোথায়ই বা দেওয়া হবে, সে-সব কিছু বলেছে?"

হনুমন্তিয়াজী বললেন, "হ্যাঁ, ডাকাতরা টেলিফোনে সে-কথাও নীহারবাবুকে বলেছে। আপনি বসুন, আপনারা দুজনেই বসুন, সবই বলছি।"

বাবা-মা এখন গোগোলের দিকে নজর করলেন না। ঘটনা শোনবার জন্য দুজনে, হনুমন্তিয়াজীর দু'পাশের চেয়ারে বসে পড়লেন। হনুমন্তিয়াজীও একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, "টেলিফোনে যে-লোকটা কথা বলেছে, সে নিশ্চয়ই ডাকাতদলের সর্দার। এটা কখনো একজনের কাজ নয়, নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা দল আছে। যে-লোকটা নীহারবাবুকে টেলিফোন করেছিল, সে নাকি অবাঙালী—মানে, ভাঙা ভাঙা বাঙলায় কথা বলছিল। সে প্রথমেই নীহারবাবুকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। তারা নাকি সব সময়েই নীহারবাবুর ওপর নজর রাখছে। বলেছে, তিনি যদি পুলিসকে খবর দেন, তা হলে ডাবুকে তারা এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে।"

মা আঁতকে উঠে বললেন, "মানে, মেরে ফেলবে?"

হনুমন্তিয়াজী বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করলেন যেন এমন আজব প্রশ্ন আর কখনো শোনেননি। গোগোলের নিজেরও সেইরকমই মনে হল। পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া মানে তো মেরে ফেলাই! ও নিজে বুঝতে পারছে, আর মা বুঝতে পারছেন না? বাবা বললেন, "বুঝেছি হনুমন্তিয়াজী, লোকটা টেলিফোনে ডাবুকে মেরে ফেলার কথা বলে শাসিয়েছে। লোকটা আর কী বলেছে বলুন।"

হনুমন্তিয়াজী বললেন, "হ্যাঁ, লোকটা নীহারবাবুকে একথাও বলেছে তারা যে কেবল নীহারবাবুর ওপর নজর রেখেছে তা নয়, নীহারবাবুর টেলিফোনেও আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছে। তার মানে, ডাবুর বাবা টেলিফোনে পুলিসকে কখন কী জানাচ্ছেন বা বলছেন, সবই নাকি তারা আড়ি পেতে শুনছে। এই বলে তারা সাবধান করে দিয়েছে, টেলিফোনের কথা যেন পুলিসকে না জানানো হয়। জানানো হলেই, তারা জানতে পারবে আর তা হলেই ডাবুকেও তখনই শেষ করে দেওয়া হবে।"

মা শিউরে বলে উঠলেন, "কী সাংঘাতিক! তা হলে নীহার-বাবু কী করবেন? ছেলেধরা ডাকাতরা যখন ওঁর দিকে লক্ষ রেখেছে, তখন উনি পুলিসের কাছে গেলেও ওরা জানতে পারবে, টেলিফোন করলেও জানতে পারবে।"

হনুমন্তিয়াজী হেসে বললেন "তা ঠিক, কিন্তু ডাকাতরা তো এ বিল্ডিংয়ের সব টেলিফোনে আড়ি পাতেনি। নীহারবাবু আমার টেলিফোন থেকেই লুকিয়ে পুলিসকে সব খবর দিয়েছেন। আমার টেলিফোনে তো আর ডাকাররা আড়ি পেতে নেই? আমি নীহার বাবুকে আমার টেলিফোনে পুলিসকে খবর দিতে বললাম। পুলিসকে সব জানানো হয়ে গেছে।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "পুলিস কী বলল?"

বাবা মাকে বাধা দিয়ে বললেন "তার আগে শুনে নিই, ডাকাতরা টেলিফোন করে, নীহারবাবুকে টাকাটা কখন কোথায় দিতে বলেছে।"

গোগোলও যেন ঠিক এ কথাটাই শুনতে চাইছিল। হনুমন্তিয়াজী বললেন, "হ্যাঁ, সেই কথাটাই আগে বলে নিই। টেলিফোনে ডাকাতটা বলেছে, আজ রাত্রি দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে—ঠিক আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে নীহারবাবু যেন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে পার্কসার্কাস ময়দানে হাজির থাকেন।"

বাবা বলে উঠলেন, "পার্কসার্কাস ময়দানে!"

গোগোলও মনে মনে তা-ই বলে উঠল, আর ওর চোখের সামনে ময়দানের ছবিটা ভেসে উঠল। অবিশ্যি রাত্রি দশটার সময়ে পার্কসার্কাস ময়দানের চেহারা কেমন, ও তা কখনো দেখেনি, একমাত্র পুজোর সময় একবার পুতুলখেলা ছাড়া। কিন্তু সেটা ছিল চারদিকে ঢাকা, আলো আর লোকজনের ভিড়ে।

হনুমন্তিয়াজী বললেন, "হ্যাঁ, পার্কসার্কাস ময়দানে, দক্ষিণ দিকে, ঠিক দরগা রোডের কোণ বরাবর, রাত্রি দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে নীহারবাবুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে হাজির থাকতে বলেছে। তার মানে বুঝতে পারছেন? ময়দানের দক্ষিণে, দরগা রোডের কোণ বরাবর জায়গাটা এমনিতেই একটু অন্ধকার মতন থাকে। এক পাশে দরগা রোড, আর এক পাশে ট্রাম লাইনের দিকে যাবার নিরিবিলি রাস্তা। তা ছাড়া সামনে ফাঁকা ময়দান তো আছেই। ডাকাতের দল খুব ভেবেই জায়গাটা ঠিক করেছে। বিপদে পড়লে, পালাবার অনেকগুলো দিক তারা হাতে রেখেছে। তবে তারা নীহারবাবুকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে নীহারবাবু যেন একলা যান। কারোকে না দেখলেও তিনি যেন ঠিক দশটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি টাকাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই সময়ের মধ্যে যে-লোক তাঁর সামনে গিয়ে বলবে 'মেরা নাম ডাবু' তার হাতেই যেন তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেন। টাকাটা দিয়ে তিনি বাড়ি ফিরেই তাঁর ছেলে ডাবুকে পেয়ে যাবেন।"

গোগোল বলে উঠল, "ডাকাতটা নিজেই বলবে, 'মেরা নাম ডাবু' ?"

গোগোলের দিকে এবার সকলের নজর পড়ল। গোগোল ভাবল, এবার বাবা-মা নিশ্চয় ওকে ধমকে ভিতরে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু বাবা-মা তা করলেন না। তাঁরা হনুমন্তিয়াজীর কথা শুনতেই ব্যস্ত ছিলেন। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু টাকাটা দেবার পরেই ডাবুকে যে বাড়িতে পাওয়া যাবে তার গ্যারাণ্টি কী?"

হনুমন্তিয়াজী হাত নেড়ে বললেন, "গ্যারাণ্টি কিছুই নেই ওদের কথাই গ্যারাণ্টি বলে মেনে নিতে হবে। আসলে ডাকাতরা যখন টাকাটা নিয়ে নিরাপদে পালাতে পারবে তখনই ডাবুকে ওরা ছেড়ে দেবে। এমনভাবে ছেড়ে দেবে, যাতে ডাবু বাড়ি ফিরে যেতে পারে। আমার তা-ই মনে হচ্ছে। অবিশ্যি ডাকাতরা নীহারবাবুকে শাসিয়ে দিয়েছে ওরা ময়দানের চারদিকে লক্ষ রাখবে। যদি একটাও পুলিস দেখা যায়, অথবা সন্দেহজনক কিছু মনে হয়, তা হলে ওরা নীহারবাবুর কাছেও ঘেঁষবে না।" বলে হনুমন্তিয়াজী গোগোলের দিকে ফিরে বললেন, "ডাকাতদের ওটা হচ্ছে একটা কায়দা, যাকে বলে সংকেত। 'মেরা নাম ডাবু' হল ওদের সাংকেতিক ভাষা যাতে নীহারবাবু বুঝতে পারেন যে-লোক তাঁর সামনে এসে ওই কথাটা বলবে, তাকেই টাকাটা দিয়ে দিতে হবে।"

গোগোলের কাছে ডাকাতদের এই কায়দাটা খুবই অভিনব মনে হল। ডাকাতটা হয়তো মুখোস পরে আসবে, অথবা আপাদ-মস্তক ঢাকা দিয়ে আসবে, আর নিজের পরিচয় দেবে 'ডাবু' বলে। অদ্ভুত! এদিকে গোগোলের বাবা-মা আর কোন কথা বলতে পারছিলেন না। ঘরের মধ্যে যেন একটা ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

হনুমন্তিয়াজী হাত নেড়ে আবার বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকাতটা নীহারবাবুকে আর-একটা কথা বলেছে। তাতেই বোঝা গেল, দলটা যে-সে দল নয়, খুব মারাত্মক। নীহারবাবু কোন্ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা রাখেন, ডাকাতরা তাও জানে। বলেছে, আজ নীহার-বাবু ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলেন কি না, তাও তারা লক্ষ রাখবে। যদি নীহারবাবু আজ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা না তোলেন, তা হলে তারা বুঝবে, উনি টাকাটা দিতে চান না, ছেলেকেও ফেরত চান না।"

বাবা যেন অধৈর্য আর অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু ডাকাতরা জানছে কী করে, নীহারবাবুর ঘরে পঞ্চাশ হাজার টাকা নেই?"

হনুমন্তিয়াজীর যেন কোন ভয়-ডর নেই, এইভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "তা হলেই বুঝুন, ডাকাত-দল কতটা সেয়ানা, আর কত খবর রাখে। তারা নিশ্চয় জানে, নীহারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘরে রাখেননি। তাছাড়া, এ তো সোজা কথা, দরকার না থাকলে পঞ্চাশ হাজার টাকা কেউ ঘরে তুলে রাখে না। ডাকাতরাও সেটা বোঝে।"

বাবা যেন বেশ হতাশ হয়েই বললেন, "তা হলে বলছেন, কিছুই করার নেই?"

হনুমন্তিয়াজী বললেন, "কেন কিছু করার থাকবে না। ডাকাতরা যা বলবে, তাই মেনে নিতে হবে? তা কখনো হয়? তবে হ্যাঁ, আমি নীহারবাবুকে বলেছি, উনি যেন নিজের টেলিফোন একদম ব্যবহার না করেন। আমার টেলিফোন থেকেই পুলিসকে সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিস অফিসার এখানে আসতে চেয়েছিলেন। আমি বারণ করে দিয়েছি। কারণ ডাকাতরা হয়তো মিথ্যে বলেনি, তারা নীহারবাবুর ওপর, আর এই বিল্ডিংয়ের ওপর নজর রেখেছে। পুলিস এলেই তারা বুঝতে পারবে, নীহার-

ঝন্টু মন্টু ও বড়রা

চিত্র - পরাগ রায়
বয়স - ১২ বছর

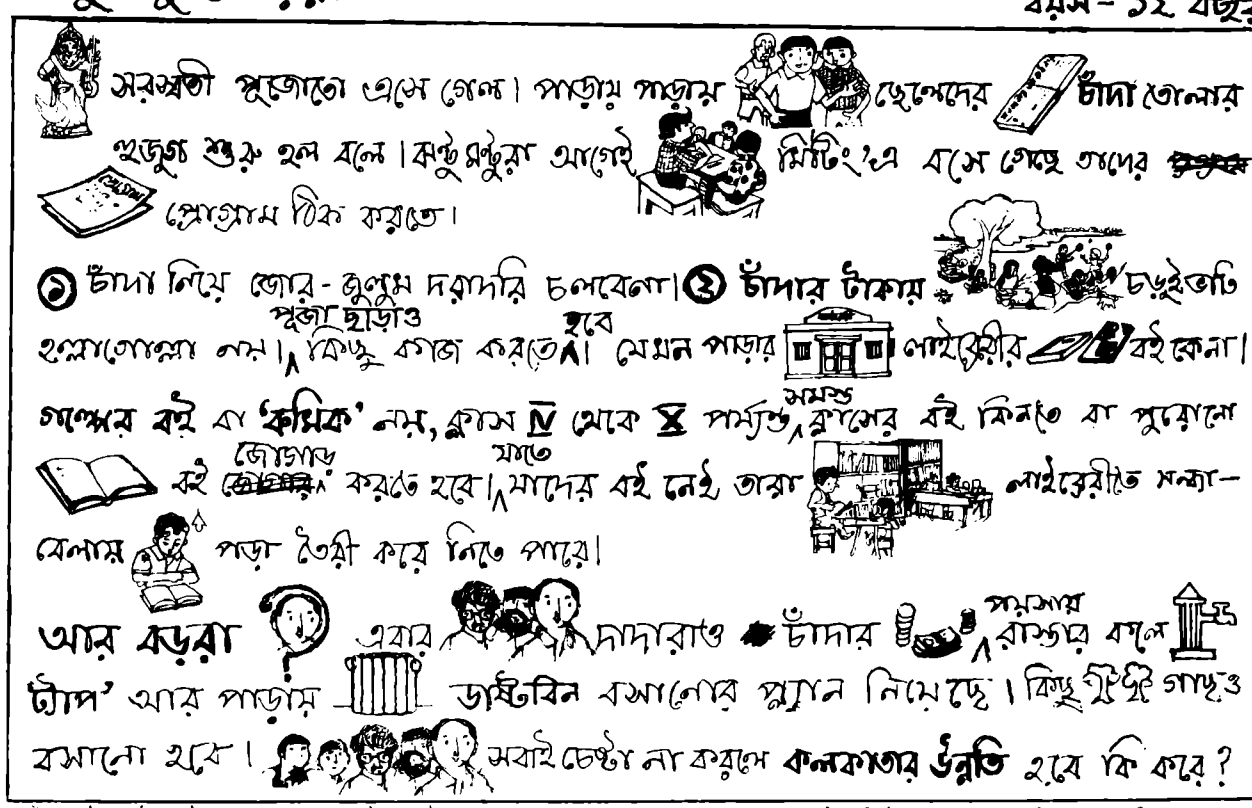

এই শহরটা ঝন্টু-মন্টুর মত তোমারও। এই শহরটার ভাল মানে তোমারও ভাল,–ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি.এম.ডি.এ)

'মুভানুটি প্রজেক্ট' (বাংলা) 'ক্যালকাটা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার' (ইংরাজী) প্রতিটির দাম এক টাকা। নগদে বা মনিঅর্ডারে সি.এম.ডি.এর অফিস ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা–১৭ তে পাওয়া যাচ্ছে।

বাবু তাদের কথা রাখেননি। পুলিসও ব্যাপারটা বুঝেছে। আমার সঙ্গে অফিসারের কথা হয়েছে। তিনি এখানে আসবেন না, তবে সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তারাও লক্ষ রাখছে। সব ব্যাপারটাই এখন চুপি চুপি খেলার মত চলছে। আমি নীহারবাবুকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে আনতেও বলেছি।"

বাবা অবাক হয়ে বললেন "কিন্তু ডাকাতরা তো ব্যাঙ্কের থেকে ফেরার পথেই নীহারবাবুর কাছ থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিতে পারে?"

হনুমন্তিয়াজী হেসে বললেন, "এতই সহজ? পুলিসকে তো সবই জানানো হয়েছে। এখন নীহারবাবুর ওপর যেমন ডাকাতরা নজর রাখছে, তেমনি গোয়েন্দা বিভাগও তো নজর রাখছে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরাও তো ব্যাঙ্কে থাকবে, নীহার-বাবুর পিছু-পিছু ঘুরবে। রাস্তায় টাকা ছিনিয়ে নিতে গেলেই ডাকাতদের ওপর গোয়েন্দারা ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

হনুমন্তিয়াজীর কথা শেষ হতে না হতেই কলিংবেলটা বেজে উঠল। বঙ্কিমদা গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই হনুমন্তিয়াজীর বাড়ির কাজের লোকটি ভিতরে ঢুকে ব্যস্তভাবে বলল, "আপকা এক জরুরি টেলিফোন আয়া।"

বাবাদের থেকে বয়স্ক হনুমন্তিয়াজী, অদ্ভুতভাবে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "নিশ্চয়ই পুলিস অফিসারের টেলিফোন! আমি চললাম।" বলেই কাজের লোকটির সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

গোগোলের কানে তখন হনুমন্তিয়াজীর একটি কথা লেগে আছে, "সব ব্যাপারটাই চুপি চুপি খেলার মত চলছে।" কথাটা ভেবে বেশ মজা লাগছে। চোর পুলিসের খেলা! অথচ কেউ কারুকে চেনে না। কিন্তু আসলে কী ঘটতে যাচ্ছে, কিছুই বোঝা গেল না। গোগোল বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল "তা হলে এখন কী হবে বাবা? পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ডাবুদাকে ছাড়িয়ে আনা হবে?"

বাবা বললেন, "তা কী করে হয়? তা হলে তো ডাকাতদেরই জিত হয়ে যাবে। কলকাতার মত শহরে যেখানে নামকরা পুলিস অফিসাররা রয়েছেন, সেখানে ডাকাতদের কাছে হার মানা মানে খুবই লজ্জার বিষয়। পুলিস নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।"

গোগোল কিছু বলবার আগেই, মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "পুলিস ছাই করবে। কলকাতার বুকের ওপর নিত্যি তিরিশ দিন এত সব অপরাধের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, পুলিস কোন্ ব্যাপারের সুরাহা করতে পেরেছে? নামেই কলকাতার পুলিস, আসলে নিধিরাম সর্দার। গরিব মানুষদের ভয় দেখানো ছাড়া ওরা আর কিছু করতে পারে না।"

বাবা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে হেসে বললেন, "তা একরকম মন্দ বলোনি। রোজই প্রায় কিছু-না-কিছু ঘটে চলেছে, পুলিস কোনো কিনারাই করতে পারছে না।"

মা বললেন, "ডাবু ছেলেটা দুষ্টু, কিন্তু ভগবান জানেন ওর কপালে কী আছে।"

গোগোল বলল, "আমার কী মনে হয় জানো মা? হনু-মন্তিয়াজী পুলিসের সঙ্গে মতলব এঁটে, ঠিক একটা কিছু করে ফেলবেন।"

গোগোলের দিকে তাকিয়ে মায়ের ভুরু-দুটো কুঁচকে উঠল, বেশ বিরক্ত গলায় বললেন, "এ কী, তুমি এখনো মুখ ধোওনি? ঠোঁটের ওপর খানিকটা শুকনো পেস্ট লেগে আছে। যাও, শিগ্‌গির মুখ ধুয়ে, খেয়ে নিয়ে পড়া রিভাইজ করে নাও। আর শোনো গোগোল, আমি বলে দিচ্ছি, তুমি এসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না।"

গোগোল মুখ চুন করে বাথরুমে চলে গেল। ও ঠিক জানত, মা এরকম বলবেন। গোগোল কি নিজের থেকে মাথা ঘামাতে চায়? আপনা থেকেই মনের মধ্যে ও-সব কথা তোলপাড় করতে থাকে। অবিশ্যি ও বোঝে, মা কেন ওরকম করে বলেন। ও-সব নিয়ে ভাবলে পড়া মাটি হবে। ইস্কুল থেকে রিমার্কসের খাতায় আপ্টির অভিযোগ লেখা হয়ে যাবে। আর মায়ের চোখে তা পড়বেই। কারণ গোগোল ইস্কুল থেকে বাড়ি এলে, মা আগেই রিমার্কসের খাতাটা তুলে নেন।

কিন্তু এখন বাথরুমে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে ডাবুদার ঘটনা ছাড়া, গোগোল আর কিছু ভাবতেই পারছে না। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে, খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতেও হনুমন্তিয়াজীর কথাগুলোই ওর মাথায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। পড়া রিভাইজ করতে বসে, ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারল না। পার্কসার্কাস ময়দানের দক্ষিণে, দরগা রোডের কোণ বরাবর জায়গাটার ছবি ভাবতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারল না। পার্কসার্কাস ময়দানটা ওর তেমন জানা নেই। জর্জের কথা ওর খুব মনে পড়তে লাগল। জর্জ আর ওদের বাড়ির ছেলেরা ছুটির দিনে ভোরবেলা ময়দানে বল খেলতে যায়। গোগোলকে কখনো জর্জদের সঙ্গে যেতে দেওয়া হয় না। হয়তো পারভেজ বা গোগেও কিছু বলতে পারত। ওরাও মাঝে মাঝে দিনের বেলা ময়দানে যায়। হনুমন্তিয়াজী বলছিলেন রাত্রের দিকে, দরগা রোডের কোণ বরাবর ময়দানটা নাকি নিরিবিলি আর অন্ধকার-মতো থাকে।

গোগোল ওর কল্পনায় যেন দেখতে পেল, ডাকাতের দল ঘাপটি মেরে দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ রাখছে। আর একটা ডাকাত ডাবুদার বাবার দিকে এগিয়ে আসছে! চান করে, ইস্কুলের ইউনি-ফর্ম পরতে পরতে কথাটা ভেবে গোগোলের গা যেন ছমছমিয়ে উঠল। ডাকাতদের কাছে কি বন্দুক বা রিভলবারও থাকবে? নিশ্চয়ই থাকবে। ওরা খুব সাবধান হয়েই আসবে। তা না হলে, ডাবুদার বাবাই যদি ডাকাতটাকে জাপটে ধরেন? কিন্তু গোয়েন্দা? গোয়েন্দারাও তো আশেপাশেই ওঁত পেতে থাকবে! কী ভাবে তারা থাকবে? ডাকাতরা কি তাদের চিনতে পারবে না?

গোগোল ইস্কুলের গাড়িতে ওঠার সময়ও মনে মনে আফশোস করল। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করা যেত। অবিশ্যি ও ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গেই ঘটনাটা নিয়ে গল্প জুড়ে দিল। তারপর টিফিনের সময়, গোগোলের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতেই ও মনে-মনে ভীষণ চমকিয়ে উঠল। হনু-মন্তিয়াজী বলছিলেন, যে-লোকটা কাল রাত্রি দুটোর সময় টেলি-ফোনে কথা বলছিল, সে নাকি অবাঙালী। ভাঙা-ভাঙা বাঙলায় কথা বলছিল। কথাটা মনে পড়তেই গোগোলের চোখের সামনে সেই ড্রাইভারের চেহারাটা ভেসে উঠল। যে নিজেকে চান্দা সিংয়ের মামা বলে পরিচয় দিয়েছিল।

গোগোলের কেন লোকটার কথা মনে পড়ল? লোকটার কথা মনে হতেই, আবার মহেশানিদের দরজা-বন্ধ ফ্ল্যাটের কথাও মনে পড়ে গেল আর সেই সব শব্দ। ডাবুদাকে চুরি করার ব্যাপারে ও-সব ভাববার কোন মানেই হয় না। তবু গোগোলের মাথা থেকে চিন্তাটা গেল না। ঠিক করল, ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ও আজ আবার মহেশানিদের লকের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে দেখবে। আজও কি চান্দা সিংয়ের সেই মামার দেখা পাওয়া যাবে? লোকটার কথা গোগোল কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

(ক্রমশ)

ছবি সমীর সরকার

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

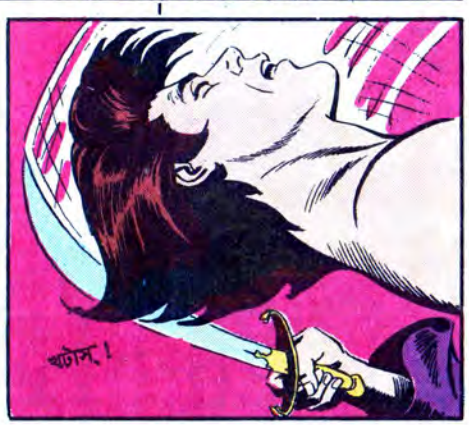

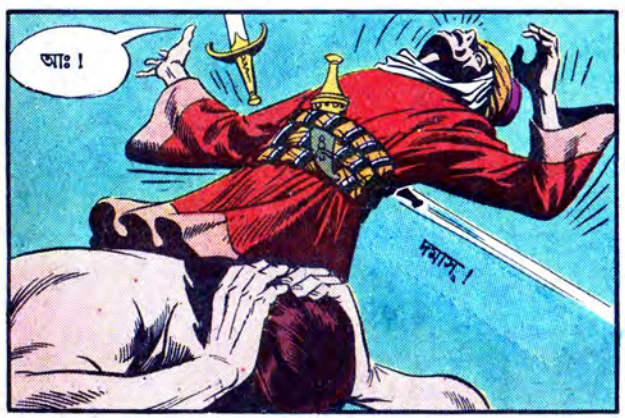

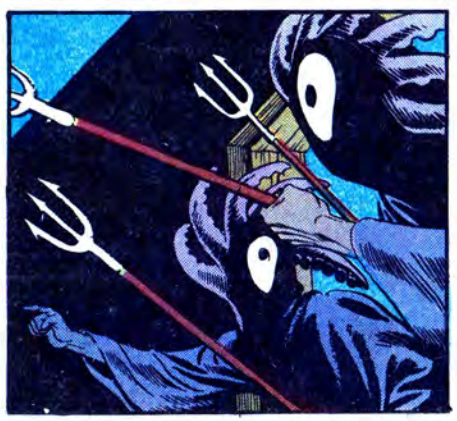

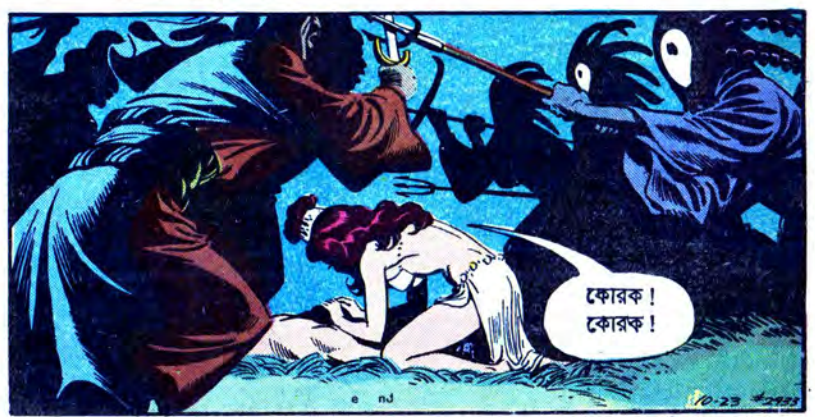

(এর পর ছাব্বিশের পাতায়)

ভূত দেখেছিলাম

সেদিন ছিল স্কুলের আগের দিন। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। তারিখটা ঠিক মনে নেই। বাবা মাকে নিয়ে গেছেন বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে। আমি যাইনি। স্কুলের সব কিছু গোছগাছ করতে হবে বলে আমি আমার পাঁচ বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ লাইট নিভে গেল। হাতের কাজকর্ম সব গেল ভেস্তে। হ্যারিকেন বা মোমবাতিতে কি কাজ করা যায় ? যাই হোক, আমরা বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। আমাদের ছয়জনেরই সাহস এবং শক্তি আছে। গল্প শুরু হল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নিয়ে। আমরা গল্পগুজব তর্কাতর্কি করে যাচ্ছি সমানে। এমন সময় জানলা দিয়ে দেখি বাড়ির পাঁচিলের ওপাশে সাদা শাড়ি পরা একটা মেয়ে বাচ্চা ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখে আমরা চমকে উঠলাম। ভয়মেশানো চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। এক সময় মনে হল মেয়েটা হাতটা নাড়তে নাড়তে যেন এগিয়ে আসছে। আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। একটু পরেই দেখি মূর্তিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে গৌতম সবচেয়ে সাহসী। ও-ও এবার ভয় পেল। এতক্ষণে ও বলল, "জানলা বন্ধ করে দে। গাটা ছমছম করছে। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না রে।" আমরা সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবা, মা ফিরলেন। বন্ধুরা সব চলে গেল। ওই ঘটনাটি আমি কাউকে বললাম না। পরদিন সকালে পাঁচিলের কাছে গেলাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। বুঝলাম, আগের রাতে আমরা ভূত দেখেছি।

তপোজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স—১১)

খুসনের পড়া

খুসন খুসন খুসন রে
পড়তে ভীষণ ভয় রে
পড়তে যদি বলো
চক্ষু ছলছল
জ্যোতির্ময় বসু (বয়স—১০)

ছবি এঁকেছে নীলাদ্রি সাহা (বয়স ৮)

বৃষ্টিতে

বৃষ্টি পড়ে ঝরঝর
পাতা কাঁপে থরথর
মেঘ ডাকে কড়কড়
সিংহী করে গরগর।
রথীন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স—১০)

পুজো শেষ

পুজো পুজো পুজো হয়ে গেল শেষ,
নতুন জামা পরে লাগছিল বেশ।
পড়াশোনা ছিল না তো শুধু গান শোনা।
মায়ের সঙ্গে কথা ছিল পুজোতে পড়ব না।
সুদীপ ঘোষ (বয়স—৭)

আমরা [illegible]

আমার ভাই আবু
হয় শুধু কাবু
আমার বোন মিনি
খায় শুধু চিনি
নাম আমার ইসমতারা
আমি যাব ত্রিপুরা
আমার দিদি নাসিফা
সে যাবে আমেরিকা।
ইসমতারা মল্লিক (বয়স—৯)

কুকুর বেড়াল

আমাদের কেলো কুকুর
খালি লেজ নাড়ে,
গায়ে জল ঢেলে দিলে
রেগে গা ঝাড়ে।

আমাদের সাদা বেড়াল
শুধু ডাক ছাড়ে
কেলোকে দেখলে পরে
ভয়ে লেজ নাড়ে
দেবাশিস দাস (বয়স ৯)

চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানায় গেলাম
সাদা বাঘ দেখলাম
জেব্রাগুলি দাঁড়িয়ে
হাতি শুঁড় বাড়িয়ে।
ববিতা গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স—৬)

টুম্পা আর কেয়া

টুম্পা কেয়া দুই বোন,
ভাব-জমাটি সারাক্ষণ।
টুম্পা হাঁটে 'পা' 'পা',
কেয়া দেয় 'তা' 'তা'।
সকাল-বিকেল সারা বেলা,
দুটি মিলে কত খেলা।
সাজা-গোজা পুতুল-বিয়ে,
রান্নাবাড়ি জলের ঘিয়ে।
কেয়া গায় টুম্পা নাচে,
মা বসে দোরের কাছে।
কেয়া দেখায় চাঁদের বুড়ি,
টুম্পা বসে খায় মুড়ি।
টুম্পা কেয়া দুটি বোন।
উমুর ঝুমুর সারাক্ষণ।
শিল্পী রায় (বয়স ১১)

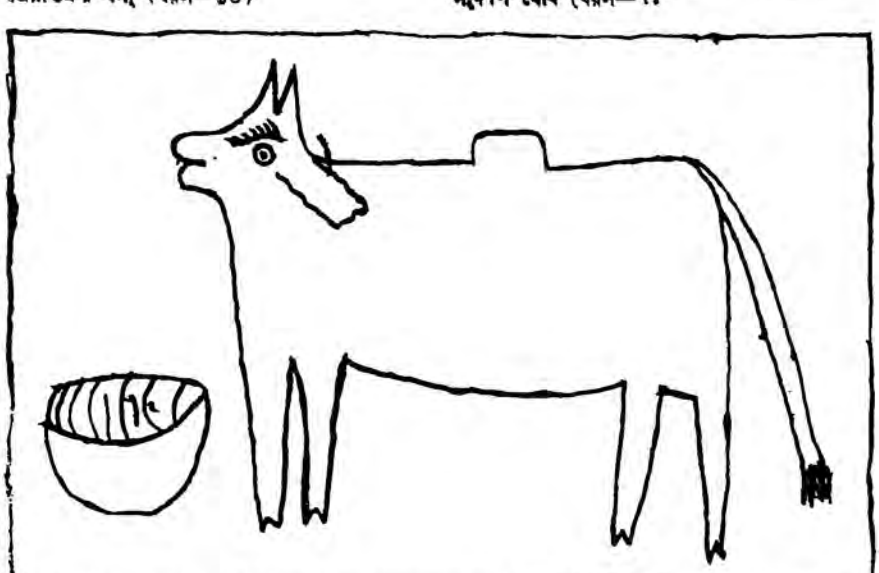

ছবি এঁকেছে সুমন বসু (বয়স ৬)

অ্যাপোলো ও লরেল

জয়ন্তী সান্যাল

অনেক, অনেককাল আগে, পৃথিবীতে বিরাট এক প্লাবন দেখা দিয়েছিল। মানুষের পাপের ভারে পৃথিবী পূর্ণ হয়েছিল বলে দেবরাজ জুপিটার মাটি ও আকাশের জলরাশি দিয়ে পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জল যাতে না শুকিয়ে যায়, আর সমস্ত মানুষ যাতে প্রাণ হারায়, সেই জন্য দেবরাজ অনুকূল বায়ুদের পাতাল-গুহায় রাখলেন বন্দী করে। শুধু-মাত্র বাইরে রইল দক্ষিণ বায়ু। তাকে বর্ষার দূত বলা যেতে পারে।

দখিনা বাতাসের ধ্বংস-লীলায় সমুদ্র ও নদীর দেবতারা সাহায্য করলেন। পৃথিবী আস্তে-আস্তে জলের নীচে তলিয়ে গেল। সবাই প্রাণ হারাল। জুপিটার পৃথিবীর সেই শূন্য ও পরিত্যক্ত রূপ দেখলেন। দেখে তাঁর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি তখন দখিনা বাতাসকে ডেকে পাঠালেন। মুক্ত করে দিলেন অন্য সব বাতাসকে। উত্তর বায়ু, পুবের বায়ু ও পশ্চিম বায়ু পৃথিবীর রিক্ত বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। ধীরে ধীরে বিশাল জলরাশি শুকিয়ে গেল। আবার সবুজ হয়ে উঠল পৃথিবী। এর পর দেবরাজ জুপিটার নতুন সৃষ্ট ভাল মানুষদের পাঠালেন নতুন পৃথিবীতে বাস করতে।

কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল, প্লাবনের ফলে বিচিত্র সব প্রাণীর আবির্ভাব হল পৃথিবীতে। তাদের মধ্যে বিরাট একটা দানব ছিল। এই দানবটা এতই নিষ্ঠুর যে, বহু দূরের মানুষরাও তার ভয়ে সর্বদা কাঁপত তখন প্রখ্যাত ধনুর্বিদ অ্যাপোলোদেব এসে তীব্র যুদ্ধে এই দানবটাকে পরাস্ত করে মেরে ফেললেন। মানুষরা তখন নির্ভয় হল। কৃতজ্ঞতা জানাল অ্যাপোলোদেবকে।

একদিন হঠাৎ অ্যাপোলোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তীরধনুকে সজ্জিত ছোট্ট দেবতা কিউপিডের। কিউপিড প্রেমের দেবতা। তাঁর তীরগুলি অলৌকিক গুণসম্পন্ন। তাঁর কিছু তীর সোনার তৈরি, সেই তীরে যে বিদ্ধ হবে, সে তক্ষুনি গভীর প্রেমে পড়বে। আর বাদবাকী তীর সীসার তৈরি। সেই তীরে যে বিদ্ধ হবে, সে অপরকে ঘৃণা করবে।

অ্যাপোলোদেব কিউপিডকে দেখে বিদ্রূপ করে বললেন, "তুমি এইসব তীর দিয়ে কী করবে? তীরধনুক তো আমার অস্ত্র। সম্প্রতি কুখ্যাত দানবকে বধ করে আমি তা প্রমাণও করেছি। ওহে কিউপিড, তোমার ধনুক আমার হাতে তুলে দাও। এই ধনুকের ওপর অধিকার শুধু আমারই।"

কিউপিড ছোট্ট দেবতা হলে কী হবে, অল্পেই তিনি খুব চটে ওঠেন। রেগে গিয়ে তিনি বললেন, "আমার তীর কিন্তু তোমাকেও জখম করতে পারে।" তারপর তিনি মন খারাপ করে সেখান থেকে চলে গেলেন।

বেড়াতে বেড়াতে একদিন কিউপিড এক মনোরম কুঞ্জে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে সুন্দরী বনদেবী (দাফ্‌নে) আপন মনে বেড়াচ্ছিলেন। কিউপিড হঠাৎ সীসার তৈরি একটা তীর দাফ্‌নের হৃদয় লক্ষ করে ছুঁড়ে দিলেন। মেয়েটি যেন সহসা হিমশীতল বাতাসে শিউরে উঠল। সে চোখ তুলে তাকাল চারদিকে। সেই সময় অ্যাপোলোদেবের সোনালী পোশাকের প্রান্তটি গাছের শাখার ফাঁকে ঝলমলিয়ে উঠল। কিউপিড তক্ষুনি সোনার তীরে অ্যাপোলোর হৃদয় বিদ্ধ করলেন।

সোনার তীরে বিদ্ধ অ্যাপোলো যেই সুন্দরী বনদেবী দাফ্‌নের দেখা পেলেন, অমনি তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। ওদিকে আবার দাফ্‌নে সীসার তীরের প্রভাবে অ্যাপোলোকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতে শুরু করে দিলেন।

দাফ্‌নে অ্যাপোলোকে এড়াবার জন্যে পালিয়ে গেলেন গভীর অরণ্যে। অ্যাপোলো যত বলেন, ভয় পেয়ো না, আমি তোমাকে ভালবাসি, দাফ্‌নে তত ভয় পায়।

ছুটতে ছুটতে অ্যাপোলো যখন দাফ্‌নের কাছে এসে পৌঁছেছেন তখন দাফ্‌নে তাঁর পিতা নদীর দেবতার উদ্দেশে বলে উঠলেন, "আমাকে বাঁচাও। হয় বসুমতী আমাকে গ্রাস করুক, নয় তুমি আমার চেহারা পালটে দাও, যাতে অ্যাপোলো আমাকে চিনতে না পারে।"

সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। সুন্দরী দাফ্‌নের শরীরের শিরা-উপশিরাগুলি যেন ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল। একটু পরেই পাতলা বাকলে তার সারা শরীর ঢেকে গেল। কালো ঘন চুল পরিণত হল সবুজ পাতায়। তার কোমল বাহু দুটি হল শীর্ণ শাখা। তার পা দুটি মাটিতে গেঁথে গেল। দাফ্‌নের পিতা কন্যার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাঁকে লরেল বৃক্ষে রূপান্তরিত করে দিলেন।

অ্যাপোলোদেব রূপসী বনদেবীকে ধীরে ধীরে একটি বৃক্ষে পরিণত হতে দেখে মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। তিনি সেই গাছের শাখায় হাত রেখে বললেন, "তুমি আমার স্ত্রী হতে পারলে না, কিন্তু আমারই বৃক্ষ হয়ে থেকো তুমি। আমার লরেল! তোমার পাতায় শোভিত করা হবে বিজয়ী বীরদের মুকুট। গ্রীষ্মে ও শীতে সমান সবুজ ও সুন্দর থাকবে তোমার পাতা।"

সেই থেকে লরেল-পাতা হল অ্যাপোলোদেবের প্রতীক, সম্মান ও জয়ের চিহ্ন। এরপর তোমরা যখনই শুনবে "crowned with laurel", স্মরণ করো অ্যাপোলো ও দাফ্‌নের কাহিনী।

ছবি অনুপ রায়

অন্তত একজন এদিকে এসো! নইলে একে বাঁচানো যাবে না!

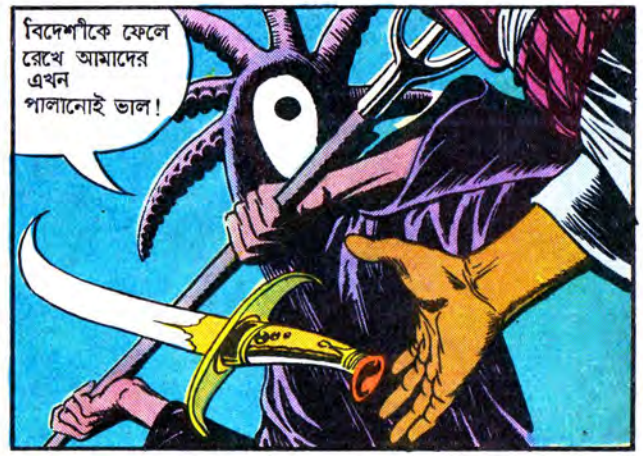
বিদেশীকে ফেলে রেখে আমাদের এখন পালানোই ভাল!

আসুন, আমরা পালিয়ে যাই!
না না, আমাকে বাঁচাতে গিয়েই এই ছেলেটি আহত হয়েছে!

তোমাদের আগে কোরকই এখানে পৌঁছেছিল!
তাহলে তো ওকেও সঙ্গে নিতে হয়!
বুরজাক! এই ছেলেটিকেও সঙ্গে নিয়ে চল্!

"প্রহরীরাই সেই শহর থেকে মরুভূমি পার হয়ে এই নদীতে আমাদের নিয়ে আসে!"

তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ! আমি কৃতজ্ঞ!
তুমিও আমাকে রক্ষা করেছিলে, কোরক! নাও, এবারে সেরে ওঠো!

আমরা কোথায়?
একটা নদীর উপরে! এই নদীর কথা বাইরের মানুষ জানে না!

এই নদী পেরিয়ে আমরা পবিত্র ক্ল্যাকাও হ্রদে গিয়ে পৌঁছব।

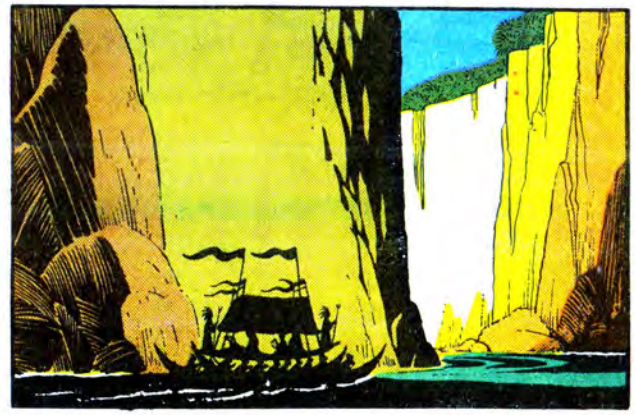

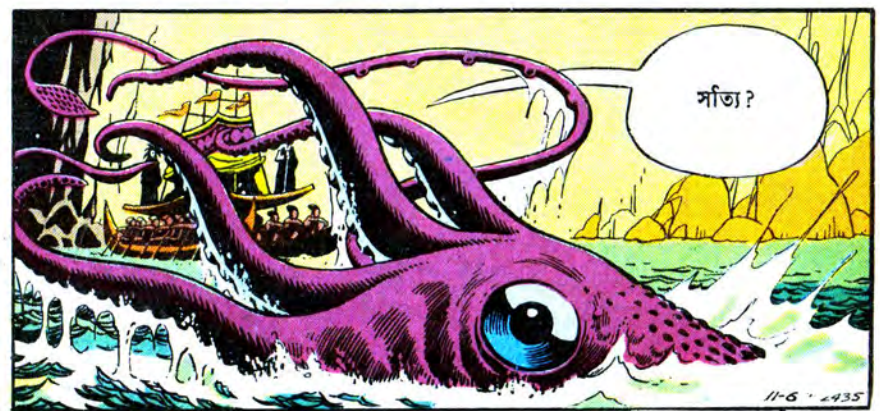

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

আটখানা

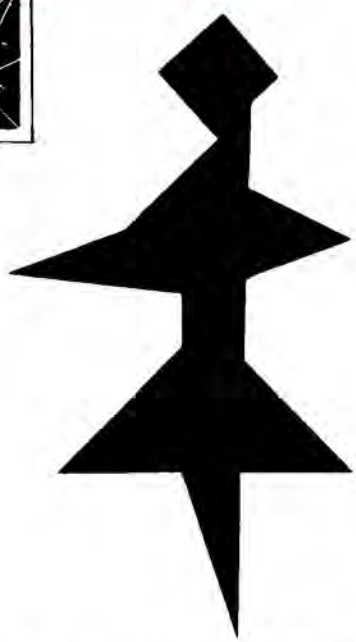

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম জামাকাপড় গায়ে চড়েছে সকলের। পার্কে, মাঠে গেলে দেখা যাবে, গরম জামাকাপড়-পরা ছেলেমেয়ের দল বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। কেউ কেউ আবার একটু ছোটাছুটি করে গা গরম করেও নিচ্ছে। এইরকমই এক শীতের বিকেলে পার্কে গিয়ে দেখি, কয়েকটি ছোট-ছোট মেয়ে ফ্রক উড়িয়ে বোঁ বোঁ ঘুরছে, থামছে, আবার ঘুরছে। দেখে খুব ভাল লাগল, তাই তোমাদের জন্যে সেই দৃশ্যটি আট টুকরো দিয়ে তৈরি করে এনেছি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

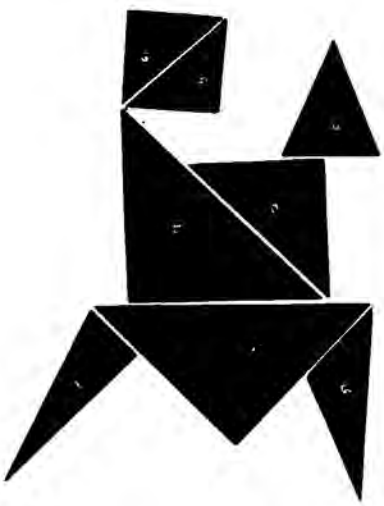

২৮ অসিত পাল

গল্প

ট্রেনে চাপলেই আমার প্রচণ্ড খিদে পায়। দারুণ মজাদার মেজাজে একটার পর একটা বাদাম ভাঙছি আর মুখে পুরে দিচ্ছি। দেখতে-দেখতে এক শো গ্রাম বাদাম প্রায় শেষ হয়ে এল।

জানালার পাশে সামনাসামনি দুটো আসন। তার একটাতে আমি, অন্যটায় ছোটুকা। ছোটকা একটা বই খুব মন দিয়ে পড়ে যাচ্ছে, সেই ট্রেন ছাড়বার আগে থেকে। অন্য দিকে কোনো খেয়ালই নেই। শেষ বাদামটা ছোটকার হাতে চালান করে দিলাম। ছোটকা এতক্ষণে বই থেকে মুখ সরাল। হেসে বলল, "শেষ তো? এরপরে কী খাওয়া হবে সতুবাবু?"

ঝালনুনটুকুও চেটে-পুটে শেষ করছি তখন আমি। হেসে বললাম, "এবার একটা ধাঁধা হোক।"

"আমি তো এতক্ষণ ধরে ধাঁধাই ভাবছিলাম—" ছোটকা হাতের বইটা মুড়ে রেখে দিয়ে জানালার বাইরে তাকাল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, "উল্টোদিক থেকে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একটা করে ট্রেন যদি আমাদের পার হয়ে হাওড়ার দিকে চলে যায়, এবং আমাদের ট্রেন যে-স্পীডে চলছে উল্টো-দিকের ট্রেনও সেই স্পীডেই যাচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এক ঘণ্টায় কটা ট্রেন হাওড়া পৌঁছচ্ছে সতুবাবু?"

এটা আবার ধাঁধা নাকি! আমি একটুও মাথা না ঘামিয়ে বলে উঠলাম, "এ তো সহজ হিসেব। পাঁচ বারং ষাট—তার মানে, বারটা।"

"উঁহু। হল না, হল না। ব্যাপারটা এত চট করে বুঝতে পারলে আর ধাঁধা হল কীভাবে?"

"তবে কটা?" অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

"কটা, সেটাই তো বার করতে হবে।" ছোটকা বলল। সুতরাং, এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা** হোক।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একটা ছোট্ট স্টেশন। আপ-ডাউন মিলিয়ে প্রতিটি জায়গার জন্য যদি আলাদা টিকিট থাকে, এবং সেই লাইনে থাকে মোট ২৫টা স্টেশন,

তাহলে ছোট্ট সেই স্টেশনে তাঁর কাছে কত ধরনের টিকি

তৃতীয় ধাঁধা ॥ একটি ছে ভাই। কিন্তু প্রত্যেক বোনের যত ভাই তার অর্ধেক সংখ্যক এ-রকম একটি পরিবারের

চতুর্থ ধাঁধা ॥ নীচের সং করে শূন্যস্থানে মানানসই সং

২৪	৯
২১	৮
২৮	৯

গতবারের উত্তর ॥

(১) ব্যানার্জি অডিটর লম্বা। সুতরাং ব্যানার্জি শর্মা অডিটরের থেকে বয় অডিটর নন। শ্রীযুক্ত দস্তিদার সঙ্গে অফিসে আসেন, সু হেড ক্লার্ক নন। তাহলে শ্রীযুক্ত হেড ক্লার্ক যেহেতু ব্যানার্জি দেখা গেল—শর্মা, সেক্ষেত্রে, ম্যানেজার একা অফিসে ম্যানেজার নন। তাহলে ব্যানার্জি স্ট্যান্ট হলেন দস্তিদার। অন্যা

(২) ৫০৪ (৩) মাইনে ১১ টাকা। (৪) বন্ধনীর বা করে ২ দিয়ে গুণ করলে প্রথ সংখ্যা পাওয়া যায়, দ্বিতীয় চিহ্নের মধ্যের সংখ্যাটি হল—(বা ১৪৪।

সত্যসন্ধ

ছবি অহিভূষণ মালিক

শনে যিনি টিকিট বিক্রি করেন.
: টিকিট থাকবে?
টি ছেলের যত বোন ততগুলোই
বোনের দিক থেকে বলতে গেলে
সংখ্যক বোন।
রিবারের কটি ভাই, কটি বোন
চর সংখ্যাগুলো মন দিয়ে লক্ষ
সেই সংখ্যাটি বসাও :

৯	৫
৮	১৩
৯	?

ডিটর এবং হেড ক্লার্কের থেকে
র্জ অডিটর বা হেড ক্লার্ক নন।
থকে বয়সে বড়, সুতরাং শর্মা
স্তিদার অডিটর ও হেড ক্লার্কের
সুতরাং তিনিও অডিটর বা
শ্রীযুক্ত জানা নিশ্চিত অডিটর।
নার্জি বা দস্তিদার নন—আগেই
ক্ষেত্রে, হেড ক্লার্ক।
ফিসে আসেন, দস্তিদার তাহলে
ব্যানার্জিই ম্যানেজার। অ্যাকাউ-
। অন্যান্য তথ্য অবান্তর।
ইনে ১১৫ টাকা, ওভারটাইম
র বাইরের সংখ্যা দুটো যোগ
লে প্রথম ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যের
তীয় ক্ষেত্রে সে-কারণে বন্ধনী-
হল—(২৮+৪৪)×২ বা ৭২×২

কিসের ফটো

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো: তপন দাশ

গতবারে ছিল আধখোলা একটি ছাতার শিক

কিসের ছবি

মনে হতে পারে সুতোয় বাঁধা বেলুন, তবে বেলুন কখনও অমন গোল হয় না। তবে! শূন্যে কিছু ভাসছে কি? না, তাও নয়। এ-নিয়ে আর মাথা ঘামাবার আগেই বলে দিচ্ছি, গোলাকার বস্তুটি হল স্টিমারের জানলা। তোমাদের এক ছোট্ট বন্ধু সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ঐ জানলা দিয়ে ছিপ ফেলেছে, আর একদৃষ্টে চেয়ে আছে ফাতনার দিকে। স্টিমারটি তীরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই তোমাদের বন্ধু মাছ ধরার সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি। ডেক থেকে সামান্য নীচে, স্টিমারের মাঝামাঝি এরকম জানলা আরও আছে। তবে, ছবিতে আমি একটাই এঁকেছি শুধুমাত্র তোমাদের বন্ধুটিকে ধরে রাখার জন্যে।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	■	৩	৪
	■	৫			■	
	■	■		■	■	
■	■	৬	■	৭	■	■
■	৮		■	৯		■
১০	■		■		■	১১
১২		■	■	■	১৩	

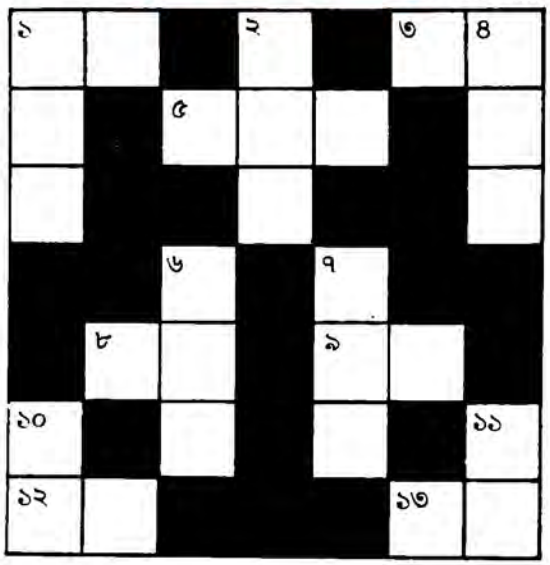

এবারের শব্দ-সন্ধানের নাম মৎস্য-সন্ধান। খাও না-খাও বেশ কিছু মাছ এই ছকের পুকুরে ছেড়ে দিতে পার।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) খোঁজখবরের প্রশ্ন। (৩) তাসের নামের প্রথমার্ধ। (৫) ছোটবড় অনেক জাত। (৮) দুধের মাথা, ছোট মাছকে বড় করতে লাগে। (৯) আ-কার দিলেই বহুবচন। (১২) ওলটালে গাছ, মাছও। (১৩) অনেক নামী-দামী ব্যাটসম্যান আর বোলারও এই। উপর-নীচ : (১) পাশাপাশি যা, পোশাকী নামে তা-ই। (২ কলকাতার একটি অঞ্চল। (৪) এর ডাকনামে বৃষ্টির ফোঁটা। (৬) মাছ উলটে পর্বতারোহী। (৭) সাবধান, কাঁটা না মারে। (১০) আ-কার জুড়লে প্রতিমার সাজে লাগে। (১১) বিখ্যাত এক বিদেশীর নাম বা পদবী।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

১ শা	খা	মৃ	গ	■	২ ছা	৩ গ
দূ	■	■	■	৪ ঘো	■	ণ্ডা
ল	■	■	■	ট	■	র
■	৫ শি	৬ বা	■	৭ ক	রী	■
৮ তু	■	র	■	■	■	৯ জ
র	■	ণ	■	■	■	ম্বু
১০ গা	রু	■	১১ ক্র	মে	ল	ক

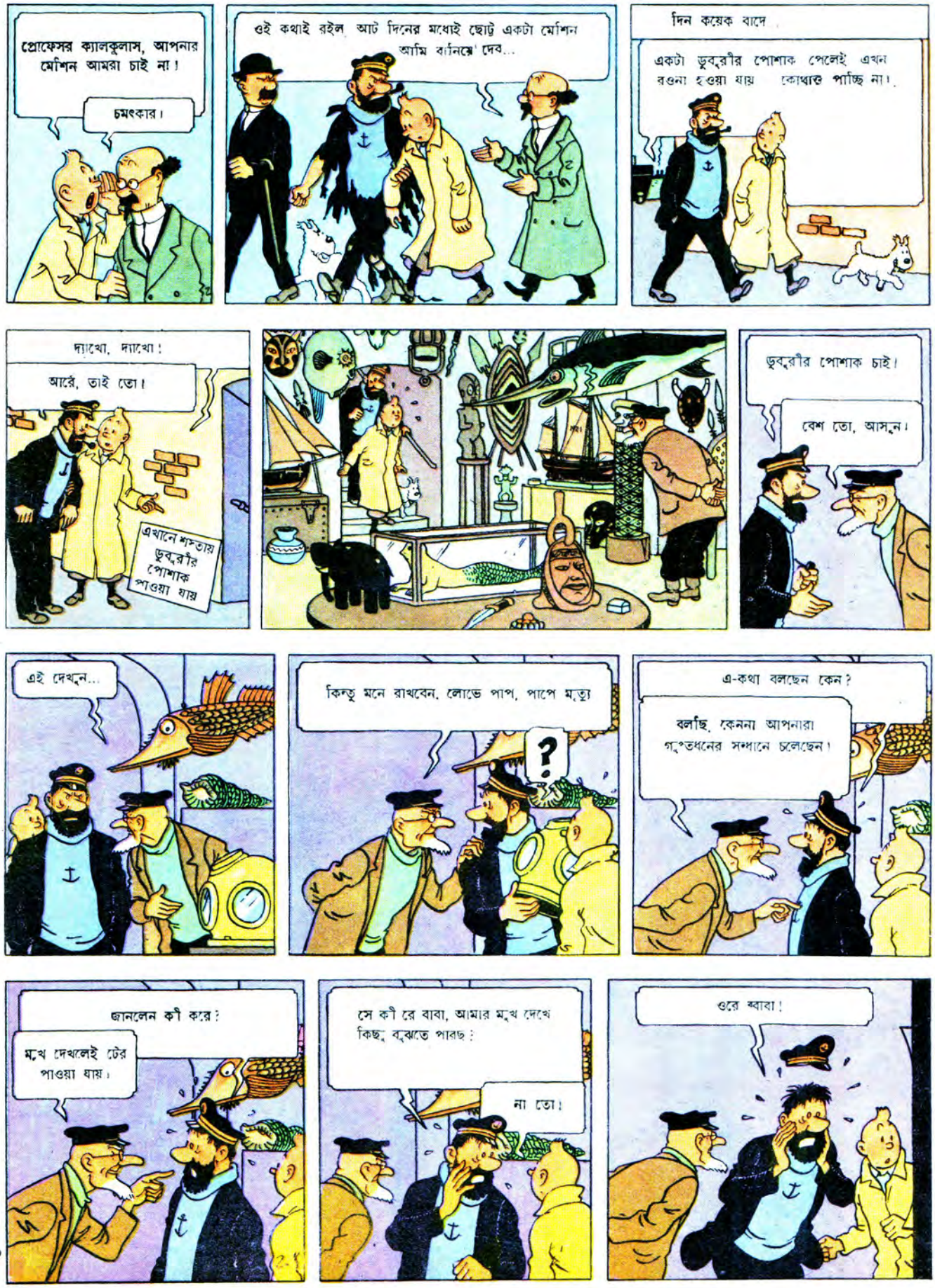
প্রোফেসর ক্যালকুলাস, আপনার মেশিন আমরা চাই না!
চমৎকার।
ওই কথাই রইল. আট দিনের মধ্যেই ছোট্ট একটা মেশিন আমি বানিয়ে দেব...
দিন কয়েক বাদে
একটা ডুবুরীর পোশাক পেলেই এখন রওনা হওয়া যায় কোথাও পাচ্ছি না।
দ্যাখো, দ্যাখো!
আরে, তাই তো।
এখানে শস্তায় ডুবুরীর পোশাক পাওয়া যায়
ডুবুরীর পোশাক চাই।
বেশ তো, আসুন।
এই দেখুন...
কিন্তু মনে রাখবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
?
এ-কথা বলছেন কেন?
বলছি, কেননা আপনারা গুপ্তধনের সন্ধানে চলেছেন!
জানলেন কী করে?
মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।
সে কী রে বাবা, আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ?
না তো!
ওরে ব্বাবা!

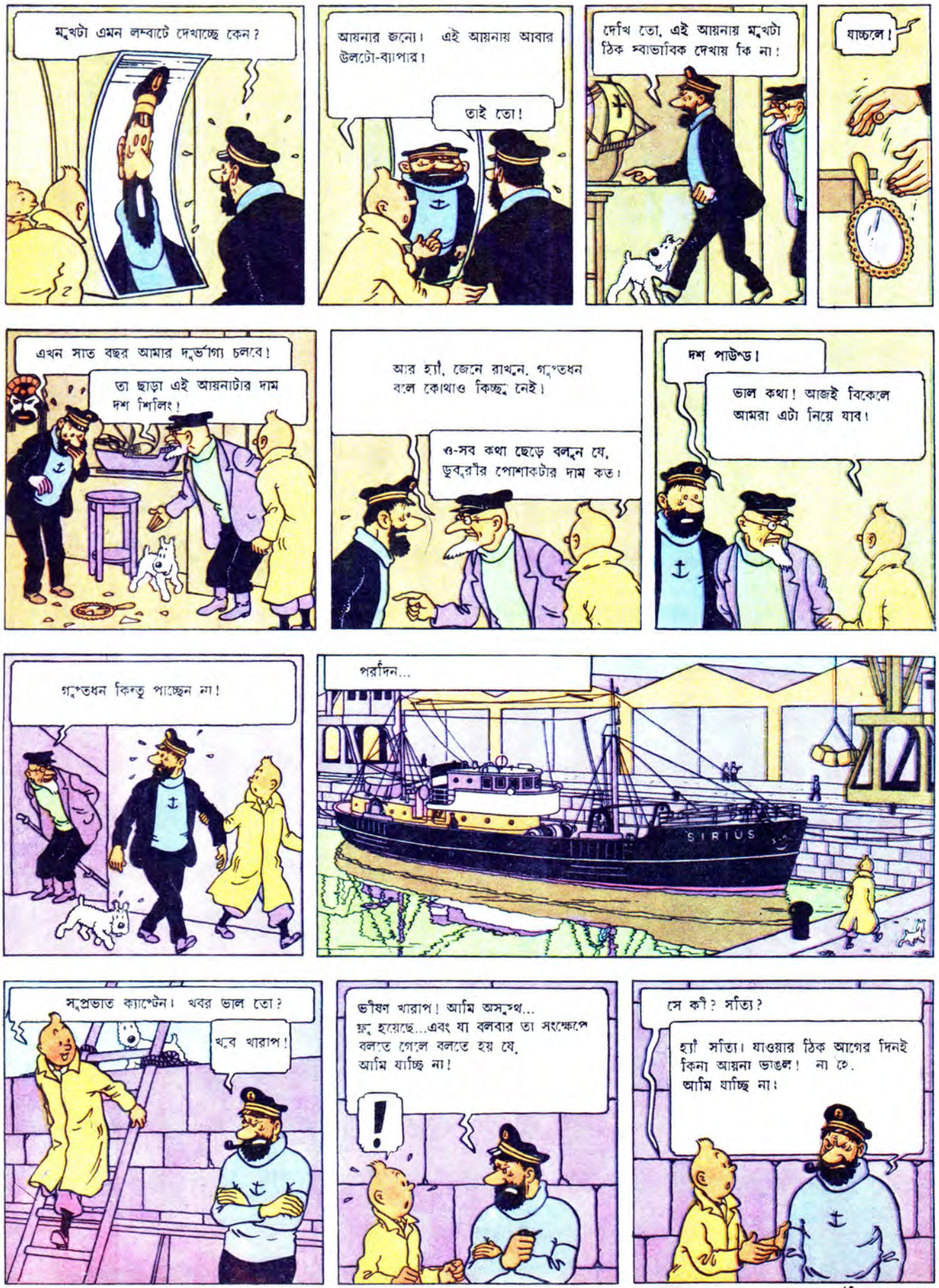

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ কানাইলাল দত্তের স্মৃতি ধরে রেখেছে এই বিদ্যামন্দির। ১৯৪৮ সালের ১৭ মে থেকে। তার আগে এই বিদ্যালয় ছিল 'কলেজ দ্যুপ্লে'। অবশ্য ১৮৬২ সালে যখন ফরাসী জেসুইট ধর্মযাজকরা এর গোড়াপত্তন করেন তখন এর নাম ছিল সেণ্ট মেরিজ ইনস্টিটিউশন।

শহীদ কানাইলাল ছাড়া যে-সব বিপ্লবী এই স্কুলে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম ঘাঁটিই ছিল চন্দননগর। কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের অন্যান্য বিখ্যাত ছাত্রদের কয়েকজন হলেন প্রথম পি আর এস জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী, স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায়, হরিহর শেঠ, 'অর্জুন' পুরস্কারপ্রাপ্ত ভোলানাথ গুঁই, ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডঃ শঙ্করসেবক বড়াল ও ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আর নিছক পরীক্ষার ফলের নিরিখেও হুগলী জেলার এই স্কুলটির রেকর্ড কম নয়। এই তো গত মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের দীপঙ্কর পাল। উচ্চ মাধ্যমিকে ১৯৭৪-এ ৮ম (বাণিজ্য শাখা), ১৯৬৪তে ৮ম (সমস্ত শাখা মিলিয়ে) এবং তার আগে ১৯৬০ সালে স্কুল ফাইনালে ৩য়, ৯ম ও ১০ম স্থান পায় বিদ্যামন্দিরের ছেলেরা। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাতেও রেজাল্ট ভাল হত। ইদানীং পাশের হার কয়েকবারই শতকরা ১০০ হয়েছে এবং ৯০-এর কম কোনবারই হয়নি। এখান থেকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বৃত্তি পেয়ে থাকে ছাত্ররা।

প্রধান শিক্ষক শ্রীনীলমণি কুমার এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। ইতিহাসের এম এ হলেও আসলে বিজ্ঞানের ছাত্র। ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। প্রধান-শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা বছর পাঁচেকের হলেও উনি শিক্ষকতা করছেন তিন দশকের মত।

মাধ্যমিক সিলেবাসের রদবদল প্রসঙ্গে কথা ওঠায় বললেন, আগেকার ম্যাট্রিকুলেশন সিলেবাসকে পরিবর্তিত করে যুগোপযোগী করে নিলেই ভাল হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যাপক হারে ফেলের জন্যে বর্তমান সিলেবাস অংশত দায়ী। অবশ্য আসল কারণ হল, সত্তরের দশকের গোড়ার কয়েকটি বছরে কিছু সুপরিচিত কারণে দিকে দিকে সারস্বত-সাধনার বিঘ্ন ঘটেছিল। সেই সময়ে যাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল তারাই এখনকার পরীক্ষার্থী। "সেদিনকার অস্থিরতার মাশুল এদের দিতে হচ্ছে এখনও"—বললেন নীলমণিবাবু।

ভাল উত্তর সম্পর্কে ও'র ধারণা : উত্তরের ভাষাগত উৎকর্ষ থাকবে। শুদ্ধ তো হবেই। বাংলা লেখায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটবে না। যা চাওয়া হয়েছে তাই লিখতে হবে। আর, প্রয়োজনস্থলে জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর সম্পর্কিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে পঠনপাঠন পদ্ধতিকেও ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনানুগ না হলে চলবে না। তারা হোম ওয়ার্ক ঠিক মত করছে কি না দেখতে হবে। শিক্ষকদের উচিত প্রত্যেক পিরিয়ডের জন্যে লেসন নোট রাখা এবং সেগুলি নিয়ে প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করা। কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে এটা করা হয়। "আর একটা কথা। বোর্ডের পরীক্ষক কমবেশি সব স্কুলেই আছেন। এঁরা যদি বোর্ডের নির্দেশগুলি ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেন ও সেই অনুযায়ী ভুল এড়িয়ে সঠিকভাবে উত্তর লিখতে তাদের প্রেরণা দেন তাহলে ওদের যথার্থ উপকার হয়।" সেইরকম, হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার খাতা ক্লাসে যখন দেখানো হয়, তখন কে কী ভুল করল তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

ইংরেজিতে জোর দিতে হবে খুব নিচু ক্লাস থেকে। 'ডেস্ক ওয়ার্ক' জাতীয় বইয়ের সাহায্যে তখন থেকেই অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া উচিত। দরকার হলে—যা সিলেবাস তাতে দরকারও হয়—অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সবচেয়ে ভাল হত প্রকৃত গ্রামার-অনুসারী টেক্সট বই থাকলে। তাতে ছেলেরা ইংরেজি শিখতে পারত ভাল করে। শুধু মাধ্যমিক পরীক্ষা-বৈতরণী পার করে দেওয়াটাই স্কুলের লক্ষ্য নয়। ছাত্র নিজে কতটা শুদ্ধভাবে লিখতে পারল, তা

দেখতে হয়।

বাংলার ব্যাপারেও নীলমণিবাবু একই কথা বললেন। লেখায় হাত পাকাতে হবে। এর জন্য ক্লাসে ক্লাসে হাতে-লেখা পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকা চাই। চাই তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহাওয়া। সমর্থন করতে গিয়ে অন্যতম সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় বললেন, আসলে সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ না থাকলে বাংলায় ভাল করা যায় না। এর জন্যে দরকার বাড়িতে প্রচুর বাইরের বই পড়া। আর ভিত শক্ত রাখতে ব্যাকরণ চর্চা যথেষ্টভাবেই চাই।

অঙ্ক নিয়ে আলোচনায় যোগ দিয়ে আর এক সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল এবং শ্রীরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, গতানুগতিকভাবে অঙ্ক না করে মূল জিনিসটি বোঝার চেষ্টা করা দরকার। "পাঁচের উপপাদ্য মুখস্থ কিন্তু সেটায় কী প্রমাণ করা হয়েছে তা বুঝিয়ে এক কথায় বলতে পারব না—এটা হাস্যকর। ক্লাসে ছেলেদের দিয়ে অঙ্কন করিয়ে প্রমাণ করিয়ে সূত্র শেখালে সেটা আর তারা ভুলবে না।" ছাত্র অঙ্ক বুঝেছে তখনই বোঝা যাবে যখন সে নিজে নিজেই একটা অঙ্ক তৈরি করতে পারছে। ভাল নম্বর পেতে হলে অনেক বই ব্যবহার, বেশি করে অভ্যাস করা, প্রশ্নমালার সব অঙ্ক শেষ করা—সবই দরকার।

একাধিক বইয়ের ব্যবহার ফিজিক্যাল সায়েন্স ও লাইফ সায়েন্স দুটি বিষয়েই দরকার। যেমন দরকার ল্যাবরেটরি ব্যবহার এবং ডায়াগ্রাম, স্কেচ ইত্যাদির সাহায্যে উত্তর পুষ্ট করা এবং পয়েন্ট অনুযায়ী ভাগ করে উত্তর লেখা। "আর উঁচু স্ট্যান্ডার্ডের—অন্তত মাধ্যমিক মানের—বই যে ব্যবহার করতে হবে, তা বলা বাহুল্য।" লাইফ সায়েন্স সংক্রান্ত প্রদর্শনী এবং "আহরণী পুস্তক" রাখার গুরুত্বের কথাও নীলমণিবাবু বললেন।

ভূগোলের শ্রীজগন্নাথ দত্ত জোর দিলেন ম্যাপ আঁকা অভ্যাসের এবং চার্ট, মডেল ইত্যাদি ব্যবহারের উপর। ও'র মতে সার্থক পরিবেশ পরিচিতির জন্যে ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা অবশাই দরকার। আর, সিলেবাসে প্রাকৃতিক ভূগোল না থাকার দরুন ঘাটতিটা নিজেদেরই পূরণ করে নিতে হবে। ইতিহাসের শ্রীকনক দাশগুপ্ত বললেন, সব সময়ে নতুন তথ্য দিয়ে উত্তরকে উন্নত করতে হবে। আর বইগুলি এমনভাবে পড়তে হবে যেন অবজেকটিভ অংশের পুরো নম্বরটা পাওয়া যায়।

সংস্কৃত নিয়ে নীলমণিবাবু দু'টি কথা বললেন। অধিকাংশ ছেলে দেবনাগরী হরফ চিনতে শেখে না। সেক্ষেত্রে নম্বর আসবে কোথা থেকে? আর শব্দরূপ ধাতুরূপ শুধু মুখস্থ না করে কার্যক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যবহার করতে শেখা উচিত। "ভাল ছেলেদের কথা অবশ্য আলাদা।"

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় সৌগত সেনগুপ্ত আশা করে, ও ফাইনাল পরীক্ষায় বেশ উপরের দিকেই থাকবে। ওর বাবা শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত খাদ্য বিভাগের ইন্সপেক্টর। সৌগতর তিন দিদি আছেন। ছোট এক ভাই। ওরা থাকে চন্দননগরের প্রায় প্রান্তে মানকুণ্ডু নতুনপাড়ায়।

ক্লাস ওয়ান থেকেই কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের ছাত্র সৌগত। সদিচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে যে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, সেটা সৌগত বুঝেছে। যে প্রথম স্থান অল্পের জন্যে ওর দখলে আসেনি এইট পর্যন্ত তা ও নাইনের অ্যানুয়ালে পেয়েছে।

"প্রতিদিন কতক্ষণ পড়?"

"দশ ঘণ্টার মত।"

"তোমার প্রাইভেট টিউটর আছেন?"

"হ্যাঁ। দুজন। অঙ্কের জন্যে একজন। আর ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ-এর জন্যে একজন। এছাড়া স্কুলের রণজিৎবাবুও অঙ্কে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

অঙ্ক এবং ফিজিক্স সৌগতর প্রিয় বিষয়। ও উচ্চশিক্ষা নিতে চায় ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এ।

ইংরেজি ও বাংলায় সৌগত শিক্ষকদের কাছ থেকে ও টেস্ট পেপার্স থেকে সম্ভাব্য প্রশ্ন সংগ্রহ করে সেগুলির উত্তর লেখে এবং শিক্ষকদের দিয়ে সংশোধন করিয়ে নেয়। নোটবই পড়াটা ওর মোটেই ভাল লাগে না। অবশ্য, অবজেক্টিভ প্রশ্নোত্তরের জন্য একটু দেখতে হয়। ইংরেজিতে টেক্সবহির্ভূত অংশের জন্যে পি কে দে সরকার, হিমাংশু ঘোষের গাইড টু গুড ইংলিশ ছাড়াও বাবার সযত্নরক্ষিত নেসফিল্ড এবং রো-ওয়েব ব্যবহার করে সৌগত। বাংলা ব্যাকরণ ও রচনার জন্যে স্কুলে পড়ানো হয় নির্মল সিংহের বই। সৌগত আরও পড়ে বামনদেব চক্রবর্তী পি আচার্যর রচনাবিচিন্তা এবং রচনাবিচিত্রা।

রোজ দু ঘণ্টা করে অঙ্ক প্র্যাকটিস করা চাই ওর। ঐচ্ছিক বিষয়ও অঙ্ক। দুই অঙ্কেই সৌগত কে পি বসু এবং কেশব নাগের বই এবং টেস্ট পেপার্স ব্যবহার করে। নাগের হায়ার সেকেণ্ডারির বইটিও ওর খুব প্রিয়।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতেও একাধিক বই পড়ে সৌগত সেনগুপ্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নীলমণিবাবুর বই ছাড়া চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সমর গুহর বই। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এবং গুহর হায়ার সেকেণ্ডারির বইও পড়ে। জীবন বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনারায়ণ পাল—সুপ্রকাশ রায়চৌধুরী, কুণ্ডু-দাশকুণ্ডু আর মেন্দা-মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্যে লেখা দেবব্রত মিত্রর বই।

ইতিহাস ও ভূগোলেও ভাল ভাল বই পড়ে সৌগত। স্কুলে পড়ানো হয় ডঃ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর ডঃ অমিতাভ রায়ের বই। ও আরও পড়ে নীরেন সেন গুহ-শ্যাম, বসু-ভট্টাচার্য, কিরণ চৌধুরী এন কবিরাজ এবং ডঃ পঞ্চানন সাহা।

সৌগতর প্রিয় খেলা ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন। "ফুটবল ভাল লাগে না"। নিয়মিত যোগ অভ্যাস করে ও।

সৌগত আনন্দমেলার গ্রাহক নয় কিন্তু প্রধান পরীক্ষকদের উপদেশ ও পরামর্শের জন্যে ও পুজো সংখ্যাটা কিনেছে। আর ওর মা মমতা সেনগুপ্ত যখন ওর মত ছোট ছিলেন (তখন দাশগুপ্ত) তখন তিনি আনন্দবাজারে সাপ্তাহিক আনন্দমেলায় প্রায়ই লিখতেন।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

(একত্রিশের পাতার পর)

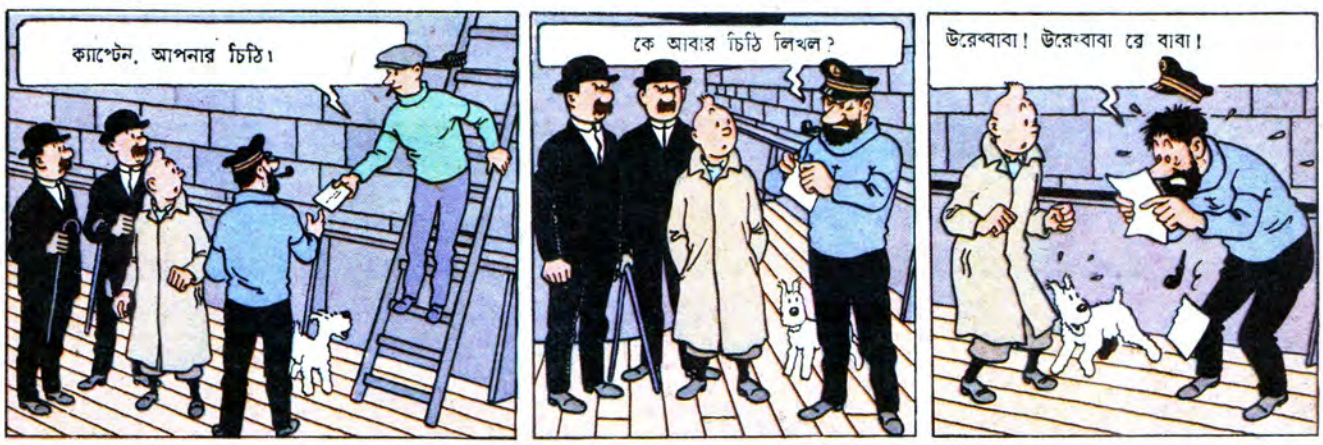

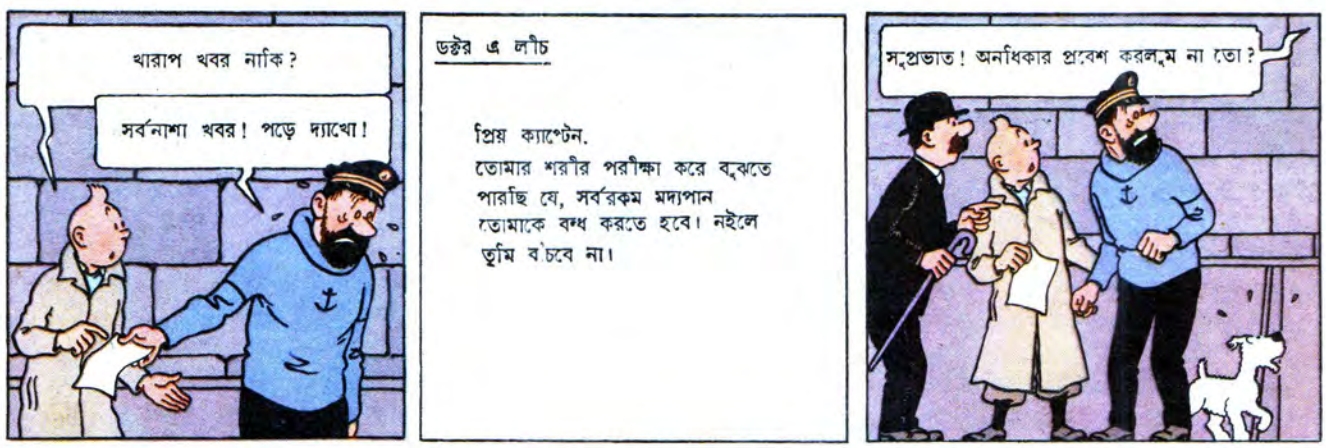

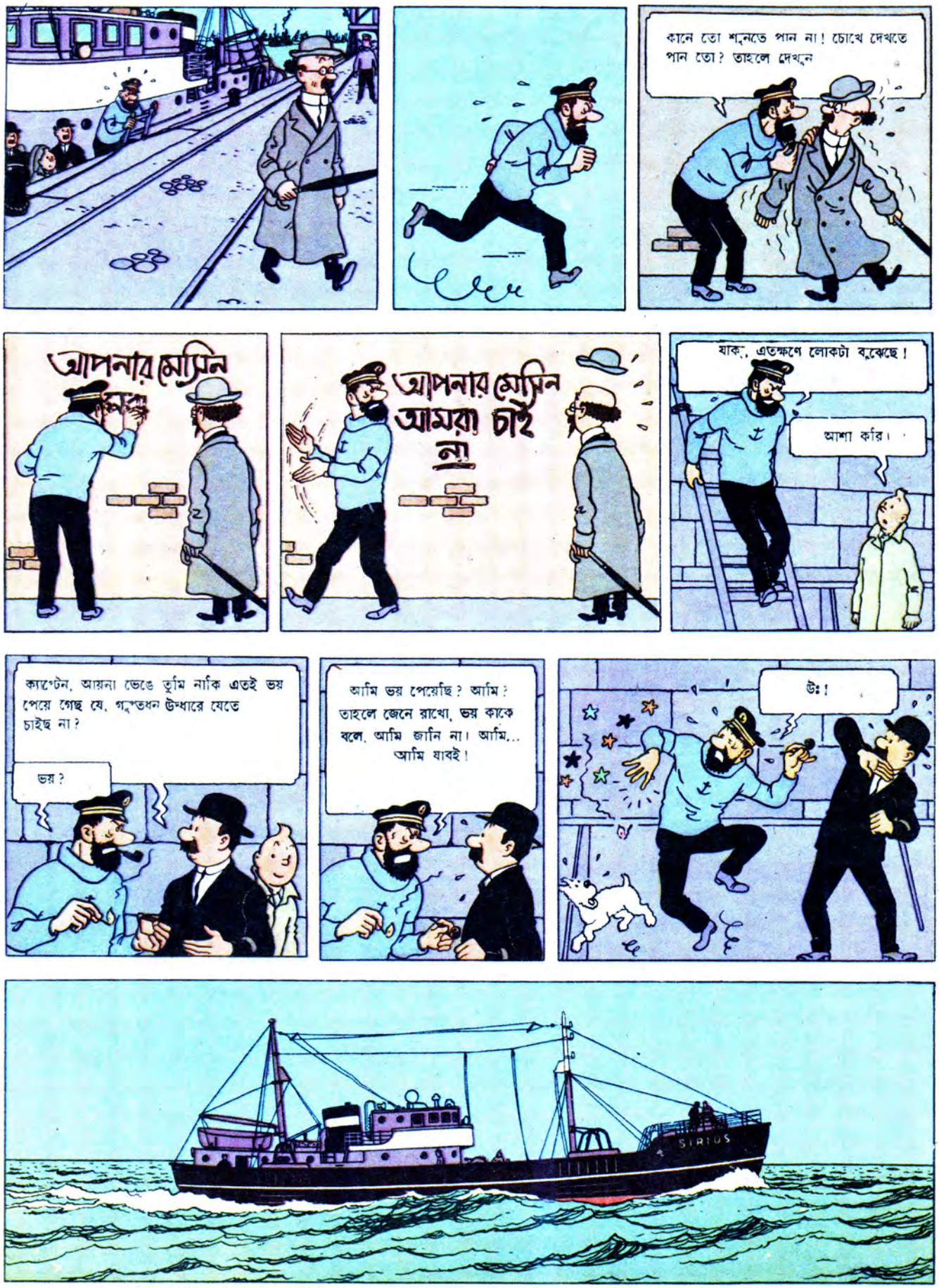

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

কুন্তক

'কুন্তক' ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে আছেন একালের একজন বিশিষ্ট কবি—শ্রীশঙ্খ ঘোষ। সম্প্রতি তিনি সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি আমাদের নিয়মিত লেখক। তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

চন্দ্রবাবুর নৌকাডুবি

কবিতার লাইন বা গানের লাইন নন্তুর মনে থাকে বেশ ভাল। কিন্তু হঠাৎ যদি গাইতে শুরু করে কখনো, সে এক কাণ্ড! 'হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাস না আর' বলতে বলতে তেড়ে আসবে বৌদি, লুটোপুটি খেয়ে হাসতে থাকবে টুম্পি, আর সমানেই গান ফুটতে থাকবে নন্তুর গলায়।

আজও বুঝি তার একটা সূচনা দেখা যায়। খুব আবেগ দিয়ে নন্তু গাইছে : জড়ায়ে আছে বাঁধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

আবেগে বাধা দিয়ে আমি বলি : কেন, ব্যথা কেন, ব'্যথা বাঁজে গাইলে পারতি!

দুঃখিত হয় নন্তু। বলে : তুমিও ঠাট্টা করছ? ব'্যথা আবার কোনো শব্দ হয় না কি?

না হয় না। কিন্তু বাঁধা বললি কি না, তাই ভাবলাম ব'্যথাই বা কী দোষ করল।

বা রে। বাঁধা তো একটা জানা শব্দ।

বাঁধা তো জানা শব্দ, কিন্তু তার মানে তো বেঁধে ফেলা, এখানে সে আসছে কোত্থেকে? কথাটা হল, জড়ায়ে আছে বাধা, এ আরেকরকম বাধা। বুঝলি হাঁদা? না কি এবার 'হাদা' বলব? টুম্পি, চন্দ্রবাবুর নৌকাডুবির গল্পটা জানিস?

কী গল্প কাকু?

জানিস না? শোন তবে। পদ্মানদীতে মস্ত এক নৌকা করে চন্দ্রবাবু ঘুরছিলেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। হঠাৎ এল প্রলয় ঝড়, নৌকো গেল কাত হয়ে, সবসুদ্ধ চন্দ্রবাবু জলে পড়লেন। নৌকোটা চলছিল নদীর পশ্চিম ধার ঘেঁষে, তাই সবাই কোনো-রকমে সাঁতরে এসে উঠে পড়ল এই কূলে, পদ্মার পুব ধারে আর ফিরতে পারল না কেউ।

নন্তু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল : হঠাৎ এই গল্প বলার মানে?

মানে? মানে একটা আছে। আসলে চন্দ্রবাবুর সেই সাঙ্গো-পাঙ্গরা হল চন্দ্রবিন্দুর দল। সেই নৌকোডুবির পর থেকে পদ্মার ওপারে আর চন্দ্রবিন্দুর দেখা পাওয়া যায় না। আর এপারে? ঝুড়ি ঝুড়ি চন্দ্রবিন্দু। যেখানে সেখানে।

দাদার মতো?

বলতে পারিস, দাদার থেকেও বেশি। শুনিস নি এদিকে অনেকে হাসপাতালকে বলে হাঁসপাতাল, হাঁসিকে বলে হাঁসি। আবার ওদিকে হয়তো চাঁদকেও বলছে চাদ, হাঁসকে হাস। বড়ই মুশকিল হয়েছে।

মুশকিল হয়েছে শুধু তোমার, আর কারো না। তুমি বড্ড পিটপিটে হয়েছ। কথাটা বোঝা গেলেই তো হল? চাদ বললেও লোকে বুঝতে পারবে কী বলা হচ্ছে, হাঁসপাতাল বললেও কেউ ভুল করে হাঁসের কাছে দৌড়বে না।

তা হতে পারে। কিন্তু সব সময় কি আর তা বলা যায় নন্তু? চন্দ্রবিন্দু থাকা-না-থাকায় মানে যে একেবরেই পালটে যায় অনেক সময়ে সেটা জানিস? কুঁড়ি আর কুঁড়ির মধ্যে প্রভেদ নেই কোনো? ফুলের কুঁড়ি না লিখে যদি ফুলের কুড়ি লিখে বসে কেউ, তবে তো আমি ভাবব কুড়িটা ফুলের হিসেব হচ্ছে। কাদাকে যদি তোর মতো কেউ কাঁদা বলে, কান্না পাবে না?

টুম্পি বলে : কাদা দেখলে সত্যিই কিন্তু কান্না পায়, যাই বলো।

তা অবশ্য পায়। কিন্তু একটা লাগছে পায়ে, আর একটা আসছে চোখে, সেটা তো মানতে হবে? তেমনি ধর, কাচা আর কাঁচা, আটা আর আঁটা, গোড়া আর গোঁড়া, ছাদ আর ছাঁদ, দাড়ি আর দাঁড়ি, আশ আর আঁশ, গাই আর গাঁই।

গাঁই আবার কী?

গাইগুলো মরে ভূত হলে তবে বোধহয় গাঁই হয়।

নন্তু আজ খুবই রেগেছিস দেখছি। গাঁইগোত্র শুনিস নি? কথাটা এসেছে 'গ্রামীণ' থেকে। আচ্ছা বেশ, ওটা ছেড়ে দাও। বলো, গা আর গাঁ? এবার?

কিন্তু কোথায় চন্দ্রবিন্দু হবে আর কোথায় হবে না, তা কি বোঝা যায়, বলো?

যাবে না কেন? দুচারটে ব্যতিক্রম ছেড়ে দিলে বেশির ভাগ সময়েই বেশ বোঝা যায়। নন্তু যে রাগ করে ভূতের কথাটা বলল, ওটা মনে রাখলেও কাজ চলে। আসলে তো সবটাই নাকী সুরের ব্যাপার, তাই না? এখন ভেবে দেখ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির মধ্যে নাক লাগছে কোথায় কোথায়? ঙ ঞ ণ ন ম ং, এই তো? শব্দের মধ্যে ওইগুলো থাকলেই পালটে গিয়ে চন্দ্রবিন্দু হতে পারে। অঙ্ক থেকে আঁক, তেমনি বাঁক শাঁখ। কুণ্ডন কোঁচা, ক্রোঞ্চ কোঁচ। বণ্টন থেকে বাঁটা, ষণ্ড থেকে ষাঁড়। চন্দ্র হল চাঁদ, বন্ধু হল বাঁধু। বধূ নয় কিন্তু, সে আবার অন্য লোক। চম্পক চাঁপা, কম্পন কাঁপা। অংশু থেকে আঁশ, হংস থেকে হাঁস। এইসব চাঁদকে তো ডুবতে দিলে চলবে না!

'চন্দ্রবাবু তাঁর বিশাল সংসার নিয়ে সুখে থাকুন' : দুমদাম করে পা ফেলতে ফেলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল নন্তু।

অলৌকিক

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে

বরদা আর মানিকের একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার কথা ছিল। বন্ধু মানিক এসে পৌঁছতে পারেনি। বরদা একাই বসে ছিল সিনেমায়। তার পাশে এসে বসল অচেনা এক ভদ্রলোক। সিটে বসে-বসেই লোকটি কখন যেন মরে গেল। সিনেমা ভাঙার পর বরদা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। নীচে মানিকের সঙ্গে দেখা। মানিক তাকে যেতে দিল না। সামান্য পরে দেখা গেল, মরা লোক জ্যান্ত হয়ে দিব্যি চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। বরদা আর মানিক ছুটে গিয়ে তাকে ধরল।

এই অদ্ভুত মানুষটির নাম সিদ্ধেশ্বর। আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। সিদ্ধেশ্বর এক গবেষণার কাজ নিয়ে রয়েছেন। কোনো কোনো মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক শক্তি থাকে। সেটা কেমন করে হয়—এই তাঁর গবেষণার কাজ। অবশ্য এইসব গবেষণা কলকাতার বাড়িতে হয় না—বাইরে দুমকার দিকে একটা সেন্টার আছে, সেখানেই হয়। সিদ্ধেশ্বরের অনুরোধে বরদা শেষ পর্যন্ত দুমকার সেই সেন্টারে যেতে রাজি হল। তবে যাবার আগে জানতে পারল, সেখানে বরদার মতই দেখতে একজন লোক রয়েছে—নাম মহাদেব। লোকটা সন্দেহজনক।

৬

সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি বরদার। নতুন জায়গা, পরিবেশটাও বিচিত্র ; অস্বস্তি এবং গা-ছমছমে ভাব নিয়ে কেমন করে মানুষ ঘুমোতে পারে! ভোর হয়ে আসছে, অন্ধকার ফিকে হয়ে সবে ফরসা ফুটে উঠতেই বরদা বিছানার ওপর উঠে বসল। রাত্রে যেন বরদার কোনো বল-ভরসা ছিল না, ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়েছিল, সকালে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, নিশ্চিন্ত হল।

বিছানায় কিছুক্ষণ বসে থাকল বরদা, যতক্ষণ না চোখে দেখার মতন পরিষ্কার হয়ে ওঠে সব। তার ঘরের জানলার অর্ধেকটা কাঠ, বাকিটা কাচ। পাল্লাগুলো কেমন তেড়াবাঁকা, ফাঁক হয়ে রয়েছে, হাওয়া আসে। বরদাকে একেবারে রাজার হালে না-রাখলেও আতিথ্য-কর্মে সিদ্ধেশ্বরের ত্রুটি ছিল না। লোহার খাট, তলায় নিশ্চয় স্প্রিং রয়েছে, বিছানায় শুলেই গা ডুবে যায়; গদি, তোশক, পরিষ্কার চাদর বালিশ—সবই বরদার জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ঘরে একটা চেয়ার রয়েছে, ছোট টেবিল। এর বেশি বরদা আর কী আশা করতে পারে!

চারদিক পরিষ্কার হয়ে আসতেই বরদা বিছানা ছেড়ে নেমে এল। জামাটা গায়ে দিল। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

একেবারে ব্যারাক-বাড়ির মতন দেখতে। গোটা দুই লম্বা-লম্বা টানা একতলা বিল্ডিং, পাশাপাশি নয়, একের গায়ে অন্যটা ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতন জুড়ে আছে, অন্য পাশে ছোট মতন একটা 'কটেজ'; পেছনের দিকে বোধ হয় রান্নাবান্নার ঘর। ব্যারাক-বাড়ির কোনোটার মাথায় টালি, কোনোটার মাথায় খাপরা—মানে যাকে খোলার চাল বলে। মন্দ দেখায় না বাড়িগুলো। সত্যিই দেহাতি হাসপাতালের মতন দেখায়, কিংবা আশ্রম-টাশ্রম মনে হয়।

বরদা যেন নতুন কিছু দেখছে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল পায়চারির ভঙ্গিতে। সকালের বাতাস তার ভাল লাগছিল। কেমন এক সুন্দর গন্ধ রয়েছে, ধুলো বালি ধোঁয়া নেই বাতাসে এক ফোঁটাও। নিশ্বাস নিতেও কী যে আরাম লাগে।

পি পি রিসার্চ সেন্টারের অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়, তবু মোটামুটি চালিয়ে যাচ্ছে। চারপাশে কম্পাউন্ড ওআল। মধ্যিখানে আশেপাশে টুকরো-টুকরো বাগান। লতাপাতা ফুল চোখে পড়ে। দু-চারটে বড়-বড় গাছও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, শাল নিম হরীতকী।

একেবারে পুরোপুরি সাদা হয়ে গেল চারপাশ। সূর্য উঠছে।

এতক্ষণ বরদা কোনো সাড়াশব্দ পায়নি; মানুষজনও দেখেনি। এবার গলা পেল।

সিদ্ধেশ্বরের কথা আবার মনে পড়ল বরদার। ভদ্রলোক কাল জোর চোট পেয়েছেন কপালে। ঘোড়ার খুরের ঠোক্কর। অনেকটা রক্ত পড়েছিল। পরে ওষুধ দিয়ে লিউকোপ্লাস্ট এঁটে দিয়েছিলেন। কেমন আছেন সিদ্ধেশ্বর? জ্বরজ্বালা হয়েছে নাকি? তবে সত্যিই তিনি অদ্ভুত মানুষ, ওই টাঙার ঘোড়ার সঙ্গে সমানে যুঝে গেলেন, হার মানলেন না। ঘোড়াটাকেই বাগে আনলেন।

টাঙাঅলা কাল আর ফিরে যায়নি। ফিরে যাবার হয়ত কথাও ছিল না। এতটা পথ একা-একা রাত্রে ফিরে যাবেই বা কী করে! ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া বিপজ্জনক। টাঙাঅলা ভয় পেয়ে গিয়েছিল! আর ঘোড়াটাই বা অমন কেন করল কে জানে।

বরদা কেমন কৌতূহল বোধ করে টাঙা আর ঘোড়াটাকে খুঁজতে লাগল।

পি পি রিসার্চ সেন্টারের লোকজন এইবার সব একে-একে জেগে উঠছে। বাইরে আসছে। মুখটুখ ধুতেও যাচ্ছিল। বরদার দিকে কারও চোখ পড়ছে, কারও বা পড়ছে না। তাকাচ্ছে, দেখছে।

হঠাৎ বরদা কার যেন গলা শুনতে পেল। তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। সেই মহাদেব।

মহাদেবকে কাল দেখেনি বরদা। আজ সকালে দেখল।

মহাদেব তফাত থেকে লক্ষ করছিল বরদাকে। তারপর ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল।

বরদা ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হলেও ওপরে কোনো অস্থিরতা দেখাল না। সিদ্ধেশ্বরের কথা মনে পড়ল, তাঁর উপদেশ। লোকটাকে পাত্তা দিলে চলবে না। অগ্রাহ্য করতে হবে।

মহাদেব কাছে এসে বলল "নমস্কার"। বলে দু হাত জোড় করে যেন ঠাট্টার ছলেই নমস্কার জানাল বরদাকে।

বরদা দায়সারা গোছের নমস্কার জানাল।

"আপনিই তো কাল এলেন?" মহাদেব বলল।

ঘাড় নাড়ল বরদা।

"আপনার নাম?"

"বরদা মজুমদার।"

"কোথা থেকে আসছেন?"

"কলকাতা থেকে।"

"আমার নাম মহাদেব দাস।"

বরদা কোনো জবাব দিল না, সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পাশে-পাশে মহাদেবও হাঁটছিল। "এমন আশ্চর্য ঘটনা কেমন করে ঘটল, মশাই। আমরা যেন যমজ!"

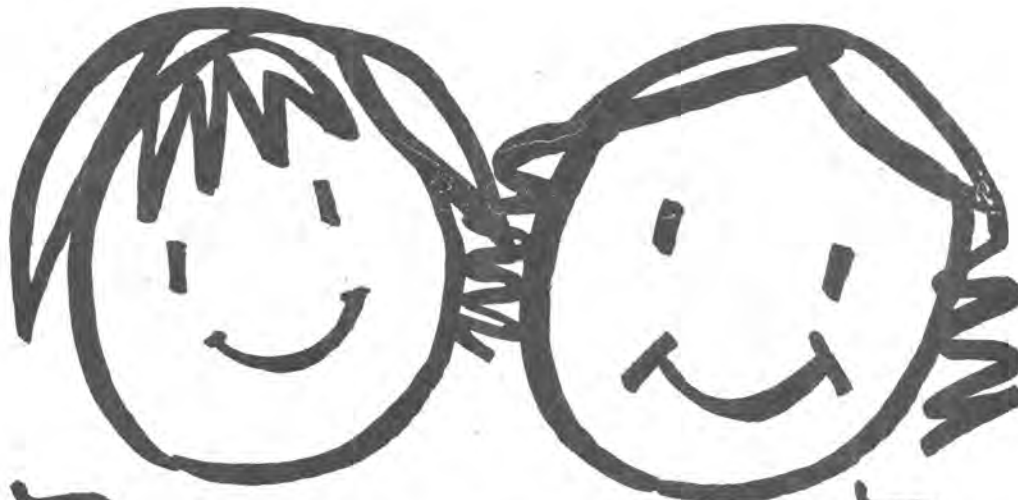

ইস্কুলে যেতে বাটা

Bata

গাইড ১৮
সাইজ ১২-১, ২-৫
টা. ৩২.৯৫, ৩৬.৯৫

চাম্পিয়ন ১৫
সাইজ ৯-১১½, ১২-১½, **২-৫**
টা. ২৫.৯৫, ২৮.৯৫, **৩৪.৯৫**

বরদা নিজেকে সামলাচ্ছিল। সে যেন বিন্দুমাত্র অবাক হয়নি, গ্রাহ্যও করেনি, বলল "কে বলল যমজ?"

"বলেন কী, চেহারার এমন মিল...!"

"শয়ে-শয়ে পাওয়া যায়। আপনি এখানে থাকেন, নিজেকে ছাড়া দেখতে পান না। কলকাতায় যান—আরও পাঁচ-সাতটা মহাদেব পেয়ে যাবেন। দিল্লি যান, কম করেও দুটো।" বলেই কী মনে হল বরদার, মহাদেবকে জব্দ করার জন্যে বলল, "আমার ছোট ভাই, বছর দেড়েকের ছোট, অবিকল আমার মতন দেখতে। বাড়িতেই লোকে ভুল করে বসে। আপনার সঙ্গে আমার আর কতটুকু মিল?"

মহাদেব কথা বলতে পারল না। বোধ হয় বরদার সঙ্গে তার মিল-অমিল খুঁটিয়ে দেখছিল।

খানিকটা পরে বলল, "আপনি কী করেন?"

বরদা বলতে যাচ্ছিল, কিছুই করা হয় না; হঠাৎ তার মনে হল, একটু চালাকি করা ভাল। মহাদেবকে তার ঠিকুজি কোষ্ঠী জানানোর তো প্রয়োজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে একবার আকাশের দিকে মুখ তুলল, যেন মহাদেবের কথা শুনতে পায়নি। সূর্য উঠে গেছে। আকাশ থেকে রোদ নামছে ধীরে-ধীরে। বাঃ, চমৎকার।

মহাদেব পিছু ছাড়ল না। পাশেপাশেই হাঁটছিল।

"সিধুবাবুর বন্ধু আপনি?" মহাদেব আবার বলল।

বরদা বিরক্ত বোধ করলেও কিছু বলল না, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। "শত্রুও হতে পারি।"

"শত্রু?"

"কেন, শত্রু হতে পারা যায় না?" বলে নিজের বিরক্তি স্পষ্ট করেই জানিয়ে ফেলল, রুক্ষভাবে তাকাল মহাদেবের দিকে, তারপর হনহন করে এগিয়ে গেল।

মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ল।

সামান্য এগিয়ে হাঁফ ফেলল বরদা। আচ্ছা এক লোকের পাল্লায় পড়েছিল আঠার মতন আটকে থাকে লোকটা। তবে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, মহাদেব অতি চতুর এবং বুদ্ধিমান। বরদার মতন মানুষকে এক হাটে বেচে অন্য হাটে কিনতে পারে। কোনো সন্দেহ নেই, বরদার ওপর সে নজর রেখেছে।

আরও একটু এগিয়ে আসতেই টাঙাটা দেখা গেল। ঘোড়া আরও খানিকটা তফাতে। বাঁধা রয়েছে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরকেও দেখতে পেল বরদা। দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বরদা বলল, "কেমন আছেন?"

সিদ্ধেশ্বরের কপালে লিউকোপ্লাস্ট। দু-চারটে আঁচড়ের দাগ নীল হয়ে আছে চোখের পাশে। বাঁ দিকের চোখের কাছটায় ফোলা। মুখটাও শুকনো।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ব্যথা রয়েছে। রাত্রে জ্বর এসেছিল।"

"এখনও জ্বর আছে?"

"না বোধ হয়। দু-একদিন ভোগাবে। ওষুধপত্র লাগিয়েছি সেরে যাবে।"

"আপনি ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কেন? ও হল পশু!"

সিদ্ধেশ্বর একটু যেন হাসলেন। "ঘোড়ার চেয়েও বড় পশু এখানে আছে।"

বরদা বুঝল না। বলল, "আপনাদের মহাদেবের সঙ্গে এই-মাত্র পরিচয় হল।"

"দেখলাম।"

"ও মশাই ঘুঘু লোক। ঠিক নজর রেখেছিল। সকালেই ধরেছে।"

"কী জিজ্ঞেস করছিল?"

"ও তো আমায় জেরা করছিল," বরদা বলল। মহাদেবের

সঙ্গে তার কথাবার্তা যা হয়েছে বলল সব।

"আমার কী মনে হয় জানেন সিদ্ধেশ্বরবাবু?" বরদা বলল, "আমার একটা ছদ্ম-পরিচয় তৈরি করে রাখা উচিত ছিল। নয়ত লোকটাকে আমি সামলাতে পারব না।"

সিদ্ধেশ্বর হেসে বললেন, "আপনি তো নামটাও পালটাতে চাইলেন না?"

"চাইনি। তখন বুঝিনি ব্যাপারটা। এখন অন্যগুলো পালটাতে চাই।"

সিদ্ধেশ্বর ভাবছিলেন। বললেন, "হবে। আমি আপনাকে বলে দেব।"

বরদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আপনি মুখটুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন। প্রথমে আপনাকে আমাদের এই সেণ্টারের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তাঁর কাছে নিয়ে যাব। তারপর একবার সব ঘুরিয়ে দেখাব।"

"উনি কোথায় থাকেন, আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা?"

সিদ্ধেশ্বর পুবের দিকে হাত বাড়িয়ে সেই ছোট 'কটেজ'-টা দেখাল।

"কী নাম ওঁর?"

"যামিনীভূষণ মৈত্র।"

বরদা পুবের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য বেলায় বরদা গেল যামিনীভূষণকে দেখতে। সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর।

ঢাকা বারান্দায় আর্ম চেয়ারে বসে ছিলেন যামিনীভূষণ। বয়েস হয়েছে যথেষ্ট। সত্তরের ওপারে পৌঁছে কেমন নির্জীব

হয়ে পড়েছেন। মানুষটিকে এখন দেখলে কেমন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী মনে হয়। মাথায় একটি-দুটির বেশি চুল নেই, নেড়া। পরনে গেরুয়া কাপড়, পাট করা। গায়ে ফতুয়া। ফতুয়ার ওপর একটা চাদর ছিল। পায়ে পাতলা চটি, রাবারের। চোখে ভাল দেখতে পান না। গোল কাচের মামুলি চশমা চোখে। কোনো রকম শখ নেই, শৌখিনতা নেই একেবারে সাদামাটা মানুষ।

বরদার কেমন ভক্তিই হল।

সিদ্ধেশ্বর আগেভাগেই বলে রেখেছিলেন নিশ্চয়। যামিনীভূষণ বরদাকে দেখলেন, কিন্তু বিশেষ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। সাধারণ কথাবার্তাই বললেন। বরদার ঘরবাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকে বরদা—কে কে আছে বাড়িতে, এই জায়গাটা কেমন লাগছে ইত্যাদি।

বরদা কথা বলতে-বলতে চারপাশ দেখছিল। যামিনীভূষণের অন্তত একটা শখ চোখে পড়ছিল বরদার। বারান্দার চারদিকেই ফুলের টব সাজানো। গাছপালা ভালবাসেন উনি। বাড়ির নীচেও ছোট বাগান। সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, একটা শুকনো পাতাও পড়ে নেই কোথাও।

বারান্দার ডান দিকে বোধ হয় যামিনীভূষণের অফিসঘর। তেমন কিছু দেখা যাচ্ছিল না বারান্দা থেকে, শুধু টেবিল চেয়ার, বইয়ের এক-আধটা আলমারি চোখে পড়ছিল।

সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে দু-চারটে কথা সেরে যামিনীভূষণ বরদার দিকে তাকালেন। বললেন, "তুমি এখানে এসেছ যখন তখন তোমার সুখ-সুবিধে ভালমন্দ দেখা আমাদের কাজ। কোনো অসুবিধে হলে সিদ্ধেশ্বরকে বোলো।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "এখানে নানা রকম লোক থাকে, তাদের যেমন গুণও আছে, কিছু কিছু আবার অগুণও রয়েছে অনেকের। সব সময় একটু চোখ খুলে রেখো। নিজে ভাল করে চোখে কিছু না দেখে কোনো জিনিসই বিশ্বাস কোরো না। বরং অবিশ্বাস ভাল, তবু না-জেনেশুনে দেখে বিশ্বাস করে নেওয়া ভাল নয়।"

সিদ্ধেশ্বর ইশারায় উঠতে বললেন বরদাকে। বরদা উঠে পড়ল।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত মাঠময় রোদ। টাঙাওলা তার গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। ঘোড়াটাও নেই। লোকজন যে যার মতন ঘোরাফেরা করছিল। রান্নাঘরের দিকে ধোঁয়া উঠছে। কুয়োতলায় জলটল তোলা হচ্ছে, চাকার শব্দ আসছিল।

বরদার বেশ লাগল শব্দটা শুনতে। দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল কুয়োর দিকে।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের জলের ব্যবস্থাটা পাকা করতে পারছি না। অনেক অসুবিধে। দুটো কুয়ো। একটায় হুইল দিয়ে জল তোলা হয় ; আর-একটায় রয়েছে লাটা-খাম্বা।" বলে আঙুল দিয়ে রান্নাঘরের দিকে আরও একটা কুয়ো দেখালেন।

বরদা বলল "পাম্প বসিয়ে নিন। ও, আপনাদের তো আবার ইলেকট্রিসিটি নেই।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আশাও নেই। তবে ডিজেল পাম্প দিয়ে বোধ হয় কাজটা সারা যায়।"

বরদা যদিও কিছু জানে না, বলল, "তা যায়।"

দু জনেই হাঁটতে লাগল।

হাঁটতে-হাঁটতে সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ বললেন, "আপনি বরদাবাবু, একটা পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান না?"

"মানে?" বরদা কিছু বুঝল না, অবাক চোখে তাকাল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মহাদেবকে ধোঁকা দেবার জন্যে একটা কিছু বলা দরকার। আপনি যদি পাম্প কোম্পানির লোক হয়ে যান, তা হলে আপত্তি কিসের?"

মাথা নাড়ল বরদা। "পাগল নাকি আপনি মশাই, আমি কোনো পাম্প কোম্পানির নামই জানি না। ওসব আমার মাথায় আসে না।"

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "মাথায় আসবার আছে কী! আমি কলকাতায় গিয়ে কোনো পাম্প কোম্পানিতে দেখা করতে পারি। পারি কিনা বলুন? তাদের লোক নিয়ে আসতে পারি এখানে। আপনিই সেই লোক। আপনার কোম্পানি আপনাকে পাঠিয়েছে কেমন পাম্প লাগবে, কোথায় বসানো হবে, জলের পাইপ কেমন করে বসালে সুবিধে হবে—এইসব তদারকি করে আসতে।"

বরদা হাত নাড়ল জোরে জোরে। "পারব না মশাই। আমি ধরা পড়ে যাব। পাম্প-এর 'প' পর্যন্ত আমি জানি না।"

"আপনি কি ভাবছেন মহাদেবই জানে?" সিদ্ধেশ্বর বললেন, "ওর অত খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার বুদ্ধি হবে না। আর আপনিই বা ওর সঙ্গে এসব কথা বলবেন কেন! এখানে কী হবে না-হবে তা ঠিক করার মালিক যামিনীবাবু, আর আমি।"

বরদা চুপ করে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমার অফিসে অনেক রকম কাগজপত্র পড়ে আছে। পাম্পের কথা আমি লিখেছিলাম কলকাতায় একবার। বোধ হয়, চিঠির জবাব, ক্যাটালগ, আরও কী কী পড়ে আছে ফাইলে।"

"আমরা কি এবার আপনার অফিসে যাব?"

"হ্যাঁ, চলুন। অফিসে আমাদের খাতা আছে। খাতায় এখানে যারা রয়েছে তাদের নাম ধাম, কে কবে এসেছে, কার কী বৈশিষ্ট্য সব লেখা আছে। একবার সেটা শুনে নেওয়া ভাল।"

সিদ্ধেশ্বর যেখানে থাকেন, তার পাশেই অফিসঘর।

ঘর ছোট, আসবাবপত্রও কম, তবু লোহার আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, কাচের আলমারিতে সাজানো কিছু ফাইল, বই-

পত্র. আরও টুকিটাকি জিনিস রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর লোহার আলমারি খুলে একটা বাঁধানো খাতা বার করলেন।

বরদা একটা সিগারেট ধরাল। তার ডান দিকে খোলা জানলা। জানলা দিয়ে নিমগাছ চোখে পড়ছে। এক ঝাঁক চড়ুই আর শালিখ মাঠে নেমেছে। কাক ডাকছিল কোথাও।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, "আমাদের এখানে এখন এগারোজন রয়েছে, যারা দেখার মতন। কাজটাজ যারা করে তাদের কথা ধরছি না।" বলে সিদ্ধেশ্বর খাতার পাতা ওলটালেন। এই এগারোজনের মধ্যে পাঁচজনকে আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি। বাকি ছ'জন তুলনায় খানিকটা সাধারণ।"

"মহাদেবকে বাদ দিয়ে বলছেন?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়লেন সিদ্ধেশ্বর। "যে পাঁচজনের কথা আমি বলছি—তাদের আমি পরে দেখাব। আগে শুধু তাদের পরিচয় শুনুন।"

বরদা কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে থাকল।

সিদ্ধেশ্বর বললেন, খাতায় চোখ রেখে "প্রথম. সীতারাম পাল। বয়স আটচল্লিশ। আদরার কাছে এক গ্রামে থাকত। ছেলে-বেলায় এর কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েসের সময় একবার আদরা প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে ছিটকে মাঠে পড়ে যায়। মাথায় চোট লেগেছিল, পা ভেঙে গিয়েছিল। ওই অ্যাকসিডেন্টের পর সীতারাম শুধু বেঁচেই গেল না, ওর মধ্যে এক আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা দিল। সীতারামের ডান হাতের কোথাও যদি কেটে চিরে দেওয়া যায়, তাহলে যেখান থেকে রক্ত পড়বে—বাঁ হাতেরও ঠিক সেই জায়গা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আসবে। এক হাতের যেখানে কালসিটে পড়ুক অন্য হাতেরও ঠিক সেই জায়গায় কালসিটে ফুটে উঠবে। যে-কোনো আঘাত, দুই অঙ্গে প্রায় সমানভাবে ফুটে ওঠে কেন? কী কারণে? আমরা এর কোনো সদুত্তর জানি না। সীতারাম এখানে বছর চারেক আছে। প্রথম থেকেই।"

বরদা শুনছিল। এই অদ্ভুত মানুষটির কথা সিদ্ধেশ্বর আগেও বলেছেন যেন।

"সীতারামের পর হল গোপীমোহন মণ্ডল। গোপীমোহনের বয়েস বছর চল্লিশ," সিদ্ধেশ্বর বললেন। "গোপীমোহনকে আমরা পেয়েছি এক মেলায়। খেলা দেখাত গোপীমোহন। বরফের চাঁইয়ের ওপর শুয়ে থাকত; তার মুখের ওপর চাপানো থাকত সের খানেক বরফ। গোপীমোহনকে পনেরো-বিশ মিনিট পরে উঠিয়ে নিয়ে দেখা গিয়েছে, তার শরীর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গরম হয়ে গিয়েছে নিজের থেকেই। এটা কেমন করে হয়?"

বরদার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। যত অদ্ভুত, বিদঘুটে যা কিছু সবই কি সিদ্ধেশ্বররা এই পি পি রিসার্চ সেন্টারে জড় করে রেখেছেন? এটা নিশ্চয় কোনো পাগলাদের আড্ডা।

সিদ্ধেশ্বর খাতা উলটে তৃতীয়জনের নাম বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে যেন চেঁচামেচি শোনা গেল। আর তার পরই একজন ঘরে এল ঝড়ের ঝাপটার মতন। হাঁফাচ্ছিল। চোখমুখের চেহারা অস্বাভাবিক। লোকটা বলল, "বাবু, টাঙাঅলা আধ মাইলটাক দূরে মাঠে পড়ে আছে। টাঙাটা নেই। টাঙাঅলা বোধ হয় মারা গেছে।"

বরদা চমকে উঠল। বুকের কোথায় যেন এক ভয় ছিল লুকিয়ে, সেই ভয় সমস্ত বুকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, গলা বন্ধ হয়ে এল বরদার।

সিদ্ধেশ্বর খাতাটা টেবিলে ফেলে রেখেই উঠে পড়লেন।

বরদা চোখের পলক ফেলার আগেই সিদ্ধেশ্বর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। (ক্রমশ)

ছবি মদন সরকার

শান্তনু মণ্ডলের প্রদর্শনী

মেদিনীপুরের ছেলে শান্তনু মণ্ডল। বয়সে সে তোমাদের কারো কারো সমবয়সী। এই বছরের জুনে দশ বছর পূর্ণ হয়েছে তার। মেদিনীপুরের কলেজিয়েট ইস্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্র।

শান্তনু ঠিক করেছে, বড় হয়ে ছবি আঁকবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আর্ট কলেজে ভর্তি হবে। মেদিনীপুরে সে নিয়মিত ছবি আঁকা শেখে। মাঝে মাঝে সেখানে তাঁর ছবি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে।

কলকাতার তথ্যকেন্দ্রে ২০—২২শে নভেম্বর শান্তনুর প্যাস্টেল ও জলরঙের ছবির সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রখ্যাত চিত্রকর নীরদ মজুমদার ছিলেন প্রধান অতিথি। আট, নয় এবং দশ বছর বয়সে সে যেসব ছবি এঁকেছে, তা বাছাই করে নিয়ে দেখানো হয়েছে।

মফস্বলের ছেলে শান্তনু। গ্রাম, গ্রামের মানুষ, মেলা, শালবন, কালভার্ট, গাছপালা, খোলামেলা আকাশ দেখার সুযোগ পায় সে। দীঘাও সেখান থেকে দূরে নয়। শান্তনু দেখে। যা দেখে তা তুলি আর জলরঙের সাহায্যে আঁকে। রঙের তারতম্য, ফিকে ঘন, বিভিন্ন রঙ পাশাপাশি কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে, কাছাকাছি এলে ঘনিষ্ঠ হয়, ঘন হয়ে থাকে, শান্তনু তুলিতে তুলে আনে। গাছ, কালভার্ট, উঁচুনিচু রাস্তা, সমুদ্র, বৃষ্টির পর ভিজে মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ের মেয়েদের চলে যাওয়া, এঁকেছে সে। তার তুলিতে রঙ স্বচ্ছ। জেবড়ে ধেবড়ে নোংরা হয়নি কাগজ। প্রকৃতি আর নির্জনতার রূপ সে এঁকেছে।

প্যাস্টেলে আঁকা শান্তনুর কাছে সহজ মনে হয়। জলরঙের সমস্যা হল, তুলিতে করে একটা রঙ কাগজে লাগাবার পর আর কিছু করার থাকে না। অথচ ঠিক রঙটা ঠিক জায়গায় লাগাতে পারলে ছবিটা জমে ওঠে। চারপাশে সব কিছুর রঙ সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কত পালটে যায়। ঋতু বদলাবার সঙ্গে-সঙ্গে গাছপালা, আকাশ এবং রোদের রঙ পালটায়। শান্তনু এগুলো ধরতে চায়। সে জানে ছায়ারও রঙ আছে।

বয়স্ক শিল্পীদের মতো সে সব পারে না। তবু সে চেষ্টা করে। সেটাই বড় কথা। তাই না?

স্লেট পেনসিল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনকয়েক যাবৎ নীলকমল স্কুলে যাচ্ছে না, মানে যেতে পারছে না। স্কুলে যেতে না পারার কারণ, হাত থেকে পড়ে ওর স্লেট ভেঙে গেছে, পেনসিলও ক্ষয়ে ক্ষয়ে এত ছোট হয়ে গেছে যে, আর লেখা সম্ভব নয়। এদিকে কেন্দাপাড়া গ্রামের পাঠশালার শিবু মাস্টারের কড়া হুকুম, স্লেট-পেনসিল না নিয়ে কেউ পাঠশালায় ঢুকতে পারবে না। পাঠশালা বলতে তো খড়ো চালার মাটির ঘর, বেশির ভাগ দিনই পাঠশালা বসে বাইরে গ্র্যানাইট পাথরের ডুংরির ওপরে। তবু স্লেট-পেনসিলের অভাবে পাঠশালায় না যেতে পেরে মুষড়ে পড়েছে নীলকমল। কারণ, পাঠশালায় পড়াশোনা করতে বেশ ভাল লাগে ওর। অবশ্য পেনসিল নিয়ে কোন সমস্যা নয়, দোকান থেকে অনায়াসে কিনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আসল মুশকিল স্লেট নিয়ে। বান্দোয়ানের দোকানে দরদস্তুর করে দেখেছে নীলকমল, একটা স্লেটের দাম পাঁচ সিকে, দাম কমালেও এক টাকা।

অথচ ওর বাবা গদাই মণ্ডলের এখন এক টাকা খরচ করে স্লেট কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। গদাইয়ের নিজের জমি অল্প ; তাই বারিদ মোড়লের জমিতে ভাগচাষ করে, বিনিময়ে জোটে কিছু টাকা আর খোরাকি হিসেবে ধান। টুকটাক নগদ টাকা সঞ্চয় যা ছিল, গেল মাঘ মাসে নীলকমলের দিদি লক্ষ্মীর বিয়ে দিতে গিয়ে গদাই মণ্ডল একেবারে ফতুর। গালুডিতে বিড়ির দোকানের মালিক জামাইবাবুর শখ ছিল একটা সাইকেলের, গদাই মণ্ডল ক্ষমতা না থাকলেও বিয়েতে যৌতুক দিয়েছে নগদ দুশো টাকা খরচ করে। ভাবী জামাইবাবুর জন্য পুরুলিয়ায় সাইকেল কিনতে গিয়ে একটা তিন চাকার সাইকেল খুব পছন্দ হয়েছিল নীলকমলের, কিন্তু সাইকেলের দোকানে বাবার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস করেনি। সাইকেলের দোকানে যখন কোমরের গেঁজে থেকে টাকা বের করে দোকানীকে দিচ্ছিল বাবা, তখন নীলকমলের মনে হল, যেন টাকা নয়, শরীরের হাড় ক'খানা গুনে দিচ্ছে।

অবশ্য দিদির বিয়েতে খুবই আনন্দ করেছিল নীলকমল। গালুডি থেকে বরযাত্রীর দল এসেছিল। হ্যাজাকের আলোয় কত রাত্তিরে বিয়ে হল, উলু দিল মেয়েরা, ভালমন্দ কত খাওয়া-দাওয়া—সব স্পষ্ট মনে আছে নীলকমলের। কিন্তু পরদিন বিকেলে দিদি যখন কেন্দাপাড়া ছেড়ে গালুডির দিকে রওনা দিল, তখন আচমকা মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। খুব কষ্ট হল দিদির জন্য, এত দুঃখ এই দশ-এগারো বছর বয়সের জীবনে কখনো পায়নি নীলকমল। এই পাহাড়ী জংলী গ্রাম কেন্দাপাড়া হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা, নিঃসঙ্গ। নীলকমল বয়সে ছোট হলেও বুঝতে পারে, দিদির বিয়েতে বাবার যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা খরচ তো হয়েই গেছে, উপরন্তু মহাজনের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে হয়েছে।

নীলকমল লক্ষ করে, দিদির বিয়ের পর থেকে বাবা কেমন যেন পালটে গেছে, সারাক্ষণ মনমরা, এদিকে আবার কী সব হিসেব কষে মনে মনে, আর পয়সা খরচ করে টিপে টিপে। কত-দিন যে বাড়িতে মাছ খায় না। শুধু মাঝে একদিন ঝিল থেকে মৌরলা মাছ ধরে এনেছিল নীলকমল, সেদিনই যা একটু স্বাদ বদল। তবু বাবা-মাকে মোটামুটি খুশি মনে হয়, কারণ দিদি বেশ সুখে আছে, জামাইবাবুর বিড়ির দোকান থেকে ভালই নাকি আয়। পাঠশালার অঙ্ক ভাল মতন করতে না পারলেও এইটুকু বয়েস থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব বুঝে গেছে নীলকমল।

পাঠশালায় না গিয়ে আজ সকাল থেকে একলা একলা জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় নীলকমল। স্লেট-পেনসিল না নিয়ে পাঠশালায় গেলে শিবুমাস্টারের বেত আর রামচিমটির ভয়। এদিকে বাবার কাছে টাকা চাইবার উপায় নেই। কারণ নীল-কমল বুঝে গেছে, স্লেট কিনবার টাকা চাইতে গেলে জবাব দেবে বাবা, 'লিখাপড়ির দরকার কী বটেক। উয়ার চাইতে বারিদের খেতিতে কাম করতি চল বটেক।

কিন্তু পড়াশোনা না করে খেতির কাজ করতে মন নেই নীলকমলের। ও লেখাপড়া শিখতে চায়। লেখাপড়া শিখতে পারলে দারোগাবাবুর চৌকিদার হতে পারবে। ওর খুব ইচ্ছে, বড় হয়ে পুলিস হবে। পুলিসের কত ক্ষমতা সবাই ভয় পায়। পুলিস হাত দেখালে বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে, বিনে পয়সায়

মিষ্টির দোকান থেকে সিঙ্গাড়া-জিলেপি খাওয়া যায়, আরও কত কী!

বৈশাখের মাঝামাঝি রোদ খুব চড়া। সূর্য মাঝ-আকাশে পেঁছতে বহু বাকি, তবু জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরতে বেশ গরম লাগছে। সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে না খেয়ে, পেটের ভেতরে খিদেটা চনচনিয়ে উঠেছে। নীলকমল এদিক-ওদিক তাকায়। দূরে নীল রংয়ের দালমা পাহাড়। চারদিকে শাল, পিয়াল, মহুয়া, সেগুনের জঙ্গল। মহুয়া গাছে প্রচুর হালকা হলুদ রংয়ের মহুয়া ফুল, টসটসে পাকা ফুলের গন্ধে সমস্ত জঙ্গল ভরপুর। একটা ছোট পাহাড়ী নদী, গরমে সব জল শুকিয়ে গেছে। ছাড়া ছাড়া বেশ কিছু কেঁদ গাছ, তাতে পাকা কমলা হলুদ কেঁদ ফল, মাটিতেও অনেক পড়ে রয়েছে। মাটি থেকে গোটা কয়েক কুড়িয়ে মুখে দেয় নীলকমল। পাকা, বেশ মিষ্টি, সুন্দর স্বাদ। লক্ষ্মীদিদির কথা মনে পড়ে যায়। গরম-কালের দুপুরে কতদিন দুজনে গাছতলা থেকে পাকা কেঁদফল কুড়িয়ে খেয়েছে। কুড়িয়ে পাওয়া ফলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কত মন-কষাকষি। এখন মনে পড়ায় বুকের ভেতরে একটা ব্যথা টনটন করে ওঠে। গোটা কয়েক পাকা কেঁদফল হাতে নিয়ে টিলার ওপরে বসে থাকে নীলকমল। দিদির কথা ভাবে। চোখে জল ভরে আসে।

খানিকক্ষণ পরে কিসের আওয়াজে সম্বিৎ ফেরে নীল-কমলের। দেখতে পায়, নদীনালা, খানাখন্দ পেরিয়ে দূর থেকে একটা জিপ আসছে। জিপ! এখানে জিপ এলো কোত্থেকে! তবে কি পুলিসের জিপ। জিপ একটু কাছে এলে জিপের ছাই রং থেকে বুঝতে পারে নীলকমল, না পুলিসের জিপ নয়, পাথর সাহেবের জিপ। এতক্ষণে মনে পড়ে নীলকমলের। আরে, এই তো সেই কুইলাপালের ফরেস্ট বাংলোর পাথর সাহেব, জঙ্গলে পাহাড়ে পাথরের খোঁজ করে বেড়ান। পাঠশালায় আসা যাওয়ার পথে পাথর সাহেবের এই জিপটা চোখে পড়েছে অনেকবার।

টিলা থেকে একটু দূরে জিপ থেকে নামেন জিওলজিস্ট বা ভূতাত্ত্বিক অরবিন্দ সোম। অবশ্য এ তল্লাটে গ্রামের লোকের কাছে ওঁর পরিচয় পাথর সাহেব। অরবিন্দ সোমের পরনে খাকি পোশাক, মাথায় টুপি, বেল্টে লাগানো ব্রানটন কমপাস, যা পাথরের আকৃতি-প্রকৃতি কিংবা গভীর জঙ্গলের ভেতরে দিক নির্ণয় করতে কাজে লাগে। অরবিন্দ সোমের হাতে হাতুড়ি, পেছনে গাইড কুলি, পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে জলের বোতল।

টিলার ওপর থেকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখে নীল-কমল, পাথর সাহেব এদিক ওদিক কী যেন খুঁজছেন। ওপাশে এক জায়গায় বিরাট বিরাট পাথরের দঙ্গল। ধূসর কালো রংয়ের পাথর, পরতে পরতে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। পাথর সাহেব ওরই একটা পাথরের গায়ে দমাদম মারতে শুরু করলেন হাতুড়ি দিয়ে। তারপর সেই পাথরের টুকরো আতস কাঁচের নীচে রেখে পরীক্ষা। পাথর সাহেব এত তন্ময় হয়ে কেন পরীক্ষা করছেন বনেজঙ্গলে পড়ে থাকা এইসব অকিঞ্চিৎকর পাথর, ভেবে কূলকিনারা পায় না নীলকমল। এসব পাথর এত কী পরীক্ষা করবার আছে, কতদিন এই পাথরের ঢেলা ভেঙে পুকুরের জলে ব্যাঙবাজি খেলেছে ওরা। ওর মধ্যে এমন কী গুপ্তধনের সন্ধান পেলেন পাথর সাহেব, এই ভাবনা ওকে কৌতূহলী করে তোলে। এবার টিলা থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে দাঁড়ায় একেবারে পাথর সাহেবের শরীর ঘেঁষে।

সঙ্গের কুলি হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'যা ভাগ বটি, ইখানে কি সারকস লাগতিছে বটে। যা, ভাগ—

অরবিন্দ সোম আতস কাঁচ থেকে চোখ তুলে তাকান ওর দিকে, হাসেন নরম চোখে। একটু ক্লান্ত অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করেন, 'কী নাম? কোন স্কুলে পড়? স্কুল যাওনি?'

'নীলকমল—' উত্তর দিতে গিয়ে নীলকমল চমকে ওঠে। তবে কি পাথর সাহেব জানতে পেরেছেন ওর পাঠশালায় না যাবার কথা। কিন্তু উনি কী করে জানবেন! ও তো বলেনি কাউকে। ভয়ভয় চোখে তাকায় পাথর সাহেবের দিকে।

অরবিন্দ সোম নীলকমলের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একটি সাধারণ স্বাস্থ্যের গ্রাম্য বালক, পরনে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, কিন্তু অদ্ভুত টলটলে দুটি চোখ। যে চোখ অনেক কিছু জানতে চায়।

'জানো, এটা কী পাথর?' একটু থেমে আবার বলেন, 'এটা হল স্লেট-পাথর, অনেক রয়েছে এখানে। এই পাথরেই তো পাঠশালায় লেখাপড়া করো তোমরা। তাই না!'

পাথর সাহেবের কথায় নীলকমল সত্যিই স্তম্ভিত হতবাক। ওর মুখে কথা সরে না। কী শুনছে এসব। যে পাথর দিয়ে ব্যাঙবাজি খেলে ওরা, সেই পাথরেই কি আবার লেখাপড়া করে। আর ওদের গ্রামেরই কাছে রয়েছে এত স্লেট-পাথর। অথচ ওদের এত দাম দিয়ে শহর থেকে কিনতে হচ্ছে স্লেট-পাথর। সত্যিই, কী তাজ্জব ব্যাপার!

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পাথর সাহেব কী বোঝেন জানে না, শুধু দেখে, কথা বলতে বলতে পাথর সাহেব একটা বড় পাথরের টুকরো হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে স্লেটের মাপে নিয়ে আসেন। পৃথিবীর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এরপর নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখে নীলকমল।

স্লেট-পাথরের সাইজ করা বড় টুকরোটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলেন অরবিন্দ সোম, 'নেবে, এই পাথরের টুকরোটা? লেখাপড়ার কাজ করতে পারবে। নেবে?'

এরপরও কী করে না নিয়ে পারে নীলকমল! আনন্দে ওর চোখে টলটল করছে জল। সেই জলে নীল আকাশের স্নিগ্ধ ছায়া, তাতে শিবুপণ্ডিতের বেতের ছবিটা নেই।

ছবি মদন সরকার

ছবি অনুপ রায়

স্মরণীয় পরাজয়

চিরঞ্জীব

বেদী (অল্পের জন্য প্রথম টেস্ট ফসকে গেল)

১৯৭৭। ৬ ডিসেম্বরের বিকাল। ব্রিসবেনে গাব্বা ওভালে ভারতীয় দলের ড্রেসিং রুম। কারও মুখে একটিও কথা নেই। ওঁদিকে অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকরা উল্লাসে মেতেছেন। তাঁদের জোড়াতালি দেওয়া দল ১৬ রানে জিতেছে। ভারতীয় ড্রেসিং রুমে কারো মুখে কথা নেই, সবচাইতে গম্ভীর অধিনায়ক বেদী। শেষ ব্যাটসম্যান চন্দ্র একটিও রান করতে পারেননি। তিনি আর কিছুক্ষণ টিঁকে থাকতে পারলেই ভারত হয়ত জিতত। বেদীরা এমন সুযোগ এবার আর পাবেন কিনা জানি না। ব্রিসবেনে ভারত এই প্রথম টেস্টে জিতলে মনোবল আরো বাড়ত, ধারা অব্যাহত থাকত জয়ের। কেননা, টেস্টের আগে আমাদের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকটি কান্ট্রি ম্যাচে জিতেছেন। শুধু তাই নয়, অস্ট্রেলিয়ায় এটিই হত আমাদের প্রথম টেস্ট জয়।

বলে রাখি, এর আগে ভারত দুবার অস্ট্রেলিয়া সফর করেছে। প্রথম ১৯৪৭-৪৮এ লালা অমরনাথের নেতৃত্বে। ৫টি টেস্টের একটি ড্র হয়েছিল। বাকিগুলিতে ভারত হারে। দ্বিতীয়বার ১৯৬৭-৬৮তে মনসুর আলি পতৌদির নেতৃত্বে ৪টি টেস্টেই আমাদের হার হয়েছিল। এবার বেদীর দল ওই গ্লানি থেকে মুক্ত হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল।

ব্রিসবেনের মাটি বোধ হয় ক্রিকেট-নাটকে অভ্যস্ত। চতুর্থ দিনে এবার খেলা শেষ হল, তাও আট মিনিট আগে। আর খেলা শেষে ওদের অধিনায়ক ৪১ বছর বয়সী ববি সিম্পসন যা বলেছেন, তা নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে ঃ টাই-টেস্টের পর এমন ক্রিকেট তিনি নাকি আর খেলেননি।

ক্রিকেট ইতিহাসে টাই-টেস্ট একটিই হয়েছে। এবং তা ওই ব্রিসবেনেই। ফ্রাঙ্ক ওরেলের নেতৃত্বে ১৯৬০-৬১র মরসুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া সফরে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক তখন রিচি বেনো। ব্রিসবেনে সেটিও সিরিজের প্রথম টেস্ট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৪৫৩-র উত্তরে অস্ট্রেলিয়া করে ৫০৫। তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৪ এবং অস্ট্রেলিয়া আউট হল ২৩২ রানে। দুই ইনিংসে উভয়ের ৭৩৭ করে রান। সেবার নাটকে ভরা ছিল পঞ্চম দিনটি। পঞ্চম দিনের শেষ ওভারে শেষ উইকেট পড়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ার অবধারিত জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলার ও ফিল্ডাররা। বিদেশের মাঠে আজও ওঁদের মত কেউ অমন অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পাননি।

এই ব্রিসবেনে দশ বছর আগে পতৌদির দলও হারে মাত্র ৩৯ রানে। কিন্তু এবার প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে আমাদের খেলোয়াড়রা যে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা বহুকাল স্মরণে থাকবে। প্রথম ইনিংসেই ১৩ রানে ভারত পিছিয়ে।

গাভাসকর (দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি)

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার হল ৩২৭। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৩৪১ করলে জিতবে—যা আমরা সচরাচর ভাবতেই পারি না। বিরতি দিনের আগে যখন বেঙ্গসরকার মাত্র ১ রানে আউট হয়ে যান, তখন তো অনেকেই ধরে নেন প্রথম টেস্টে ভারত অনেক রানের ব্যবধানেই হারবে। গাভাসকর প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩ রান করায় তাঁর উপরও তেমন ভরসা ছিল না। কিন্তু ক্রিকেটে বোধ হয় সবই সম্ভব এবং অসম্ভব। বিরতির দিনে নানা গল্প শোনা গেল। গাভাসকর, মহীন্দর অমরনাথ কিরমানি, বিশ্বনাথ ও বেদীকে উৎসাহিত করা হল। বেশি ভরসা গাভাসকরের উপর। কেউ কেউ লিখলেনও—গাভাসকরই কাণ্ডারীর ভূমিকা নেবেন।

৬ ডিসেম্বর গাভাসকরকে দেখে ওঁর সতীর্থরা অবাক বিস্মিত ক্রিকেট-লেখকরাও। এ যে ১৯৭১-এর গাভাসকর। যিনি সেবার প্রথম টেস্টে নেমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে তিনটি সেঞ্চুরি ও একটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। 'সানি'র ওই খেলা দেখে কেউ কেউ সেবার তাঁকে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে তুলনা করেন। 'সানি' আগে টেস্ট খেলতে কখনও ব্র্যাডম্যানের দেশে যাননি। জানি না তাঁর উত্তরসূরীর খেলা ব্র্যাডম্যানের কেমন লেগেছে। তবে ২৯৮ মিনিট ক্রিজে থেকে ১০টি চার মেরে যে বিক্রম দেখালেন গাভাসকর তার তুলনা নেই। একালের সেরা বোলার টমসনকেও তিনি ভয় পাননি। অধিনায়ক সিম্পসন ঘন ঘন বোলার বদলে এবং নানাভাবে ফিল্ডিং সাজিয়েও ২৮ বছরের এই মারাঠি যুবককে ঘায়েল করতে পারেননি। এখনকার অনুত্তেজক ক্রিকেটে চঞ্চলতা এনেছিলেন সেদিন অধিকাংশ ভারতীয়ই। মেলবোর্নে তারকাখচিত প্যাকারের সুপার-টেস্ট হয়েছে ম্লান। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার বড় ধরনের ওই স্কোরকে অতিক্রম করতে প্রত্যেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মহীন্দর ৪৭,

মহীন্দর (দ্বিতীয় ইনিংসে তেজী ব্যাটিং)

মদনলাল (প্রথম ইনিংসে এক উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ)

বিশ্বনাথ ৩৫। গত ক বছর ধরে দেখছি শেষের দিকে উইকেটরক্ষক সৈয়দ কিরমানি সংগ্রামী ভূমিকা নেন, অধিনায়কের দৃঢ়তা দেখান বিষেণ সিং বেদী। ব্রিসবেনের দর্শকরাও এর প্রমাণ পেলেন। কিরমানির ৫৫, বেদীর ২৫ নট আউট ক্রিকেটকে ঐশ্বর্যবান করে রাখবে। ব্রিজেশ বা মদনলালের ব্যাটে যদি কিছু রান আসত, প্রথম টেস্টের ফল যে অন্যরকম হত তা সকলেই জানেন। আমরা গ্লানি-মুক্ত হতাম। কিন্তু এই পরাজয়ে কি কালিমা লেপন হল আমাদের ক্রিকেটে? নিশ্চয়ই না। আমাদের ক্রিকেটাররা পরাজয় সহজে মেনে নেননি—এর চাইতে বড় কথা আর কী হতে পারে! এই মানসিকতা সিরিজের বাকি খেলাগুলিতে সাফল্য আনবে।

তবুও অন্য কথা মনে হয়। অশোক মাঁকড় টেস্টে নামলেই কেমন যেন হয়ে যান। আচ্ছা, দুই অমরনাথ—সুরীন্দর ও মহীন্দর খেললে কি খারাপ হবে? মহীন্দরের দাদা নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের সহজে মোকাবিলা করতে পারবেন।

ফুটবলের জমজমাট আসর

পুষ্পেন সরকার

কলকাতার ফুটবল মরসুম গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে। শীতে ক্রিকেট। তারপর হকি। হকির পর ঘুরে আসে আবার ফুটবল। কিন্তু এবারে শীতে ফুটবলের জমজমাট আসর বসছে কলকাতায়। নতুন বছরের প্রথম দিকেই শুরু হবে খেলা। দারুণ খেলা হবে। এ লীগ বা আই এফ এ শীল্ড নয়। অনেক বড়। কোনো বড় ক্রিকেট খেলা নেই এবছর। তার জন্যেও কোন দুঃখ থাকবে না।

ভারতের ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে সব থেকে বড় ল জতীয় ফুটবল। শুধু বড় নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ। ডুরান্ড, রোভার্স, আই এফ এ শীল্ড, ডি সি এম প্রভৃতি বড় প্রতিযোগিতাগুলিতে বিভিন্ন ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আর জাতীয় ফুটবল হল রাজ্যে রাজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

প্রতি রাজ্যের বাছাই খেলোয়াড়রা নিজ নিজ রাজ্যের সুনাম বাড়াবার জন্য মনপ্রাণ দিয়ে খেলেন। বিজয়ী রাজ্যকে বলা হয় ফুটবলে ভারতের সব থেকে শক্তিশালী রাজ্য। একটি সুন্দর কাপ পায় বিজয়ী দল। কাপটির নাম 'সন্তোষ ট্রফি', তাই জাতীয় ফুটবলের আর এক নাম সন্তোষ ট্রফির খেলা। রাজ্যগুলি ছাড়া সার্ভিসেস এবং রেলওয়েজের সন্তোষ ট্রফিতে খেলার অধিকার আছে। সমস্ত সৈন্যদলের মধ্য থেকে কুশলী খেলোয়াড়দের বাছাই করে গড়া হয় সার্ভিসেস দল। রেল দলও তৈরি হয় একইভাবে। দুটি দলই বেশ শক্তিশালী।

সন্তোষ ট্রফির খেলা শুরু হয় ১৯৪১ সালে। ভারত তখনও ভাগ হয়নি। ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ১৯৪০ সালে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাবে তাঁরা বলেন, এমন একটা ফুটবল প্রতিযোগিতা চালু করা হোক যেটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় কোনো ক্লাবের যোগদানের অধিকার থাকবে না। কী ভাবে খেলাগুলি হবে তার একটা পরিকল্পনাও পাঠান প্রস্তাবের সঙ্গে।

১৯৪০ সালের ১৪ এপ্রিল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব আলোচনা করা হয়। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না। প্রায় এক বছর পর ১৯৪১ সালের ২৭ জানুয়ারী ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। নাম দেওয়া হয় আন্তঃ-রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা। খেলাও চালু হয় ঐ বছর থেকে।

প্রথম তিন বছর বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে প্রতিযোগিতার খেলাগুলির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এইভাবে প্রতিযোগিতা চলাতে গিয়ে কিছু কিছু অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। ১৯৪৫ সালের ৩০ মার্চ ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভবিষ্যতে একটি বিশেষ রাজ্যেই খেলাগুলি হবে। যে রাজ্য প্রতিযোগিতার দায়িত্ব নেবে তারাই সমস্ত খরচ বহন করবে।

পুরস্কারের নাম সন্তোষ ট্রফি, আগেই বলেছি। ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আই এফ এ) প্রাক্তন সভাপতি স্বর্গত সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই সুন্দর কাপটি দান করেন ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসো-সিয়েশন। তখন এর দাম ছিল দেড় হাজার টাকা। রানার্স বা বিজিত দল পায় 'কমলা গুপ্তা কাপ'। আই এফ এ--র আর এক প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ এস কে গুপ্ত তাঁর স্বর্গতা পত্নীর স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই কাপটি দেন।

প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৪১ সালে সন্তোষ ট্রফির খেলা হয় কলকাতায়। বাংলা প্রথম বছরে সন্তোষ ট্রফি লাভ করে। সন্তোষ ট্রফির খেলাতে মাঝে-মাঝে বাধা পড়েছে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে প্রতিযোগিতা হয়নি।

সন্তোষ ট্রফি পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারে-শনের। যে রাজ্যে প্রতিযোগিতা হয়, ভারতীয় ফুটবল ফেডারে-শনের প্রতিনিধি হিসাবে সেই রাজ্যই প্রতিযোগিতা চালান। এবারে কলকাতায় হবে ৩৪তম জাতীয় ফুটবল। কলকাতায় ১৯৪১, ১৯৪৭, ১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫৩ সালে সন্তোষ ট্রফির খেলা হয়েছে। তবে এবারে হচ্ছে ২৪ বছর পরে।

আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষ জানিয়েছেন, ১৯৭৮ সালের ৯ জানুয়ারি খেলার উদ্বোধন হবে। ফাইনাল খেলার তারিখ মোটামুটিভাবে স্থির হয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি। আশা করা যাচ্ছে, এবার ২৫টি দল কলকাতায় খেলবে। ৮টি ভাগ করা হবে ২৫টি দলকে। ৭টি গ্রুপে থাকবে ৩টি করে দল। অবশিষ্ট গ্রুপ হবে ৪টি দল নিয়ে। গ্রুপের খেলাগুলি চলবে লীগ প্রথায়। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা উঠবে কোয়ার্টার ফাইনালে।

কোয়ার্টার ফাইনালের ৮টি দলকে আবার সমান দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন অপর গ্রুপের রানার্স এবং প্রথম গ্রুপের রানার্স অপর গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের সঙ্গে নক আউট প্রথায় খেলে ফাইনালে যাবে। প্রথম দিনের ফাইনালে কোনো অতিরিক্ত সময় খেলানো হবে না। দ্বিতীয় দিনে খেলার ফল সমানসমান থাকলে অতিরিক্ত ১৫ মিনিট খেলার ব্যবস্থা থাকবে। অতিরিক্ত সময়ের মধ্যেও যদি খেলার নিষ্পত্তি না হয় তাহলে দু দলকেই যুগ্মজয়ী ঘোষণা করা হবে।

মোহনবাগান মাঠে সমস্ত খেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রথমে গ্রুপ লীগের খেলার সময় রোজ তিনটি করে খেলা। বেলা ২টো. ৪টে ও সন্ধ্যা ৬টায়। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দুটি করে খেলা।

সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের সময়ে রোজ একটি খেলা।

সন্তোষ ট্রফি সব থেকে বেশি জিতেছে বাংলা। এ পর্যন্ত ৩৩ বারের প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলা ১৬ বার জয়ী। ৯ বার রানার্স। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ পরপর তিনবার জেতার রেকর্ড একমাত্র বাংলার। এবার কলকাতার প্রতিযোগিতায় জিততে পারলে দ্বিতীয়বার টানা তিনবার জয়ের আর এক স্মরণীয় রেকর্ড করবে বাংলা। ১৯৭৫ সালে কোজিকোড়ে এবং গতবছর পাটনাতে বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল।

ফাইনালে বেশি গোল করার কৃতিত্ব বাংলার খেলোয়াড়দের আছে ১৯৪৯ ও ১৯৬৯ সালে। প্রথমবারে হায়দ্রাবাদকে ৫-০ গোলে এবং দ্বিতীয়বার সার্ভিসেসকে ৬-১ গোলে হারিয়ে বাংলা অনেক সুনাম পেয়েছিল। আবার ১৯৭৪ সালে পাঞ্জাবের কাছে ৬-০ গোলে হার বাংলা রাজ্যের সম্মান অনেকখানি নষ্ট করেছিল।

কলকাতায় এ পর্যন্ত যে পাঁচবার প্রতিযোগিতা হয়েছে সেই পাঁচবারই বাংলার কাছ থেকে সন্তোষ ট্রফি কেউ নিতে যেতে পারেনি। আশা করা যায়, বাংলার খেলোয়াড়রা রাজ্যের ফুটবল সুনাম রাখার জন্য এবারও প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।

তোমাদের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। নতুন ক্লাস। নতুন বই। পড়ার চাপও কম। এই সময়ে ভারতের সব বড় বড় খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ। দারুণ আনন্দ। সব খেলা সকলের দেখা সম্ভব নয়। অনেকদিন ধরে খেলা চলবে। তবে মাঠে না এলেও রেডিও বা টেলিভিশনে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।

সন্তোষ ট্রফিতে কিন্তু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নেই। সব মিলে মিশে একাকার। তখন আর কোনো একটি বিশেষ দল নয়। সব দল মিলিয়ে বাংলা। রাজ্যের সম্মান। সে সম্মানের ভাগীদার সবাই। বাংলা জিতলে সে-জয়ের আনন্দ বাংলার সকলের।

সন্তোষ ট্রফির লড়াই

শ্রীখেলোয়াড়

কলকাতায় আগামী জাতীয় ফুটবলে ২৫টি দলের খেলার সম্ভাবনা। সব দল সমান নয়। আট-নয়টি দল বেশ শক্তিশালী। সন্তোষ ট্রফির লড়াই এই দলগুলির মধ্যেই জমে উঠবে। বাকিরা তুলনায় দুর্বল।

রাজ্যে রাজ্যে দল গড়ার প্রস্তুতি চলছে। এই লেখা প্রেসে পাঠাবার আগে পর্যন্ত কোন রাজ্যের চূড়ান্ত খেলোয়াড় তালিকা তৈরি হয়নি। ফলে কার শক্তি কতটা, এখনই যাচাই করা যাবে না। খেলোয়াড়দের সুনাম, এ বছর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেলার নৈপুণ্য গত বছর জাতীয় ফুটবলে খেলার ধারা এগুলি মোটা-মুটি বিচার করে দলগুলির শক্তির আলোচনা করা হয়।

কোন্ খেলার ফল কী হবে—আগ বাড়িয়ে বলতে যাওয়া ঠিক নয়। ঝুঁকি অনেক। বোকা বনে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। শক্তিশালী দল দুর্বল দলের কাছে হেরেছে। অথবা জয়ী হওয়ার মতো আগাগোড়া ভাল খেলেও শেষ সময়ে দুর্ভাগ্যের জন্য পরাজিত হয়েছে। এ জাতীয় বহু নজির খেলার ইতিহাসে আছে। তাই কলকাতায় আগামী জাতীয় ফুটবলে কে জয়ী হবে সে প্রশ্নে যাব না।

গতবারের বিজয়ী বাংলা, রানার্স মহারাষ্ট্র ছাড়া কর্নাটক, পাঞ্জাব, কেরল, গোয়া, রেলওয়েজ, অনধ্র এবং সার্ভিসেস—এই নয়টি দল বেশ শক্তিশালী। গ্রুপ লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এর মধ্যে আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে আশা করা যায়। বাংলা, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, অনধ্র, কেরল, গোয়া এবং রেলওয়েজ দলগুলি সেমি-ফাইনালে যাওয়ার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বাংলা শক্তিশালী দল গড়বে সন্দেহ নেই। এখানে কুশলী খেলোয়াড়ের অভাব নেই। গতবার পাটনাতে হাবিব, সুভাষ ভৌমিক, সুধীর কর্মকার, গৌতম সরকার, তরুণ বসু, উলাগানাথন এবং সমরেশ চৌধুরীর মত অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ছাড়াই বাংলার তরুণ দল একটি খেলাতেও ড্র না করে এবং কোন খেলাতে না হেরে যেভাবে সন্তোষ ট্রফি জিতেছিল তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঠিকমত দল গড়া হলে বাংলার কাছ থেকে সন্তোষ ট্রফি নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না।

গতবারের রানার্স মহারাষ্ট্র এবার কিছুটা দুর্বল। শোনা যাচ্ছে সাবির আলি ইস্টবেঙ্গলে এবং আরও দু-একজন খেলোয়াড় নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে খেলার জন্য আবেদন করেছেন। তবে রক্ষণভাগে রণজিত থাপা, রাইট আউট বারনার্ড এবং লেফট আউট গুডিনহো দলের সুনাম রাখতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন।

লতিফুদ্দিন। গতবার তাঁর দেওয়া গোলেই বাংলা জেতে

কর্নাটক খুবই শক্তিশালী। গোলরক্ষক সুদর্শন, ব্যাক মোহন, শেখর ও নরসিংহম ১৯৭৬ সালে মার্ডেকা ফুটবলে এবং সিউলে প্রেসিডেন্ট কাপে ভারতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। হাফব্যাক দেবরাজ ও লেফট স্টপার কণ্ঠরাজ খেলেছেন ১৯৭৬-এর মার্ডেকা ফুটবলে। গত জাতীয় ফুটবলে মোহন, কণ্ঠরাজ এবং কুমার খুবই প্রশংসা পেয়েছিলেন। ফরোয়ার্ডে তরুণেরা আছেন। পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার নিয়মিত শিক্ষা পাচ্ছেন কর্নাটকের খেলোয়াড়রা অভিজ্ঞ ভারতীয় কোচ বাসার কাছ থেকে। কর্নাটকের উপর দৃষ্টি থাকবে সকলের।

অনধ্র দলকে হারানো যে কোনো দলের কাছে হবে এক বড় সমস্যা। দলে নামী খেলোয়াড় বেশি নেই। ওয়াসিম ও মামুদ অবশ্য ১৯৭৬ সালে মার্ডেকা ফুটবলে ভারতের হয়ে খেলেছেন। অধিকাংশই তরুণ খেলোয়াড়। দলের মধ্যে বোঝাপড়া সুন্দর। ছোট ছোট পাসে খেলেন। খেলার মধ্যে সব সময়ে একটা পরি-

বড় হয়ে ওঠার খুসীতে এই মেয়েটির মন ভরপুর আপনার কন্যা ও পুত্র এই মেয়েটির মতোই নিশ্চিন্ত যে তাদের ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, বিবাহ সব-কিছুরই সুব্যবস্থা আপনিই করবেন। সানন্দে এই দায়িত্ব পালন করতে এখন থেকেই আপনি উন্মুখ। তাই না?

আপনার পুত্র-কন্যার ভবিষ্যৎ সুখী ও নিশ্চিন্ত করতে আমাদের যে কোন সঞ্চয় প্রকল্প থেকে আপনার সঞ্চয়ের আয় অনেক গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

আমাদের ৫০০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে আপনি পাবেন ৬০,২৮৫.৬০ টাকা। তাছাড়া রয়েছে আমাদের ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট, এণ্ডাওমেণ্ট বেনিফিট ডিপজিট, মাসিক আয় সার্টিফিকেট, রেকারিং ডিপজিট এ্যাকাউণ্ট প্রভৃতি নানা সঞ্চয় প্রকল্প।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস ঃ ৭, রেড ক্রস প্লেস
কলিকাতা-৭০০০০১ ● টেলিফোন ঃ ২৩-৯৭৮৪ (৩টি লাইন)
॥ অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস ॥

কল্পনা থাকে।

গতবছর থেকে কেরল এবার আরও ভাল খেলবে। গোলে ভিক্টর মঞ্জিলা, ব্যাকে সি সি জেকব, হাফব্যাক এম এম জেকব ফরোয়ার্ডে বসীর ও বালচন্দ্রন ১৯৭৬ সালে সিউলে প্রেসিডেন্ট কাপে ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সুনামের সঙ্গেই খেলেছেন সকলে। জানুয়ারিতে মোহনবাগানের শুকনো ও সবুজ মাঠ কেরলের খেলোয়াড়দের উন্নত ফুটবল খেলার আরও বেশি সুযোগ এনে দেবে।

পাঞ্জাবের সাফল্য এবারে কতটা দেখা যাবে বলা শক্ত। রাজ্যের ফুটবল পরিচালনায় দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। খেলোয়াড় নির্বাচন কী ভাবে হবে জানি না। অধিকাংশ খেলোয়াড়ের বয়স হয়েছে। মানজিৎ সিং অবসর নিয়েছেন। হরজিন্দর, গুরুদেবের প্রতিভা আগের মতো নেই। অবশ্য স্ট্রাইকার হিসাবে ইন্দার সিং এখনও ভারতের প্রথম সারিতে পড়েন। তবে পাঞ্জাবের খেলোয়াড়দের দৈহিক পটুতা এবং অফুরন্ত দম ৯০ মিনিট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে অনেক রাজ্যের খেলোয়াড়দের থেকে বেশি আছে।

গোয়ার গোলরক্ষক ব্রহ্মানন্দ পাটনাতে জাতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক হিসাবে বহু অভিজ্ঞ সমালোচকের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। ব্যাকে নিকলস পেরেরা ভাল খেলছেন। ১৯৭৬ সালে মার্ডেকা ফুটবলে পেরেরা ভারতের হয়ে সুনামের সঙ্গে খেলেছেন। গোয়ার কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় ওরকে মিলস, সেঞ্চুরি মিলস ও মফতলালে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় গোয়া পূর্ণ শক্তি নিয়ে কলকাতায় খেলতে পারবে না। স্ট্রাইকার ফ্রান্সিস ডিসুজা মোহনবাগানে আসছেন, শোনা যাচ্ছে।

রেলওয়েজ দলের সব থেকে বড় সুবিধা হবে এবারে। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় কলকাতার মাঠ, আবহাওয়া, দর্শক এবং শক্তিশালী বাংলার প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের খেলার খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। অশোক চন্দ, অ্যারল্যাণ্ডো ও রবীন দাস ভারতের হয়ে খেলেছেন। অমিত দাশগুপ্তের জুনিয়র ভারতীয় দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে। গোলরক্ষক প্রতাপ ঘোষ এই মরসুমে কলকাতায় বি এন আর-এর হয়ে ভাল খেলেছেন। রেলওয়েজ সহজে কাউকে ছেড়ে দেবে না।

সার্ভিসেস এবং তামিলনাড়ু খারাপ খেলবে না। সার্ভিসেসের অ্যালফাঞ্জো নিকলস ও তামিলনাড়ুর অ্যাব্রাহাম কোশী ১৯৭৬ সালে মার্ডেকাতে ভারতীয় দলের হয়ে খেলে এসেছেন। সার্ভিসেসের খেলোয়াড়রা সকলেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। প্রচুর দম। খুব একটা নিরাশ করবে মনে হয় না সার্ভিসেস এবং তামিলনাড়ু।

তরুণ দলগুলির মধ্যে নাগাল্যাণ্ডের নাম না করলে অন্যায় হবে। জাতীয় ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা বেশি নেই, কিন্তু প্রত্যেকটি খেলোয়াড় মনপ্রাণ দিয়ে খেলেন। শক্তি, স্বাস্থ্য দুই আছে। গোলের সামনে এসে বল মারায় দক্ষতা যদি দেখাতে পারে তাহলে নাগাল্যাণ্ডের তরুণরা অনেক শক্তিশালী দলকে বিপদে ফেলবে।

জাতীয় ফুটবলে অন্য যে দলগুলি খেলবে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা সীমায়িত। নামী খেলোয়াড় তেমন কেউ নেই। তবে তরুণরা কে কেমন খেলবে সেটা না দেখে বলা যাবে না। জাতীয় ফুটবলে ভাল খেলে সুনাম কুড়াতে সকলেই চায়। ভারতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা এবং খেলোয়াড় নির্বাচকেরা উপস্থিত থাকেন। নির্বাচকদের নজরে পড়লে ভারতীয় দলে ঢোকার সুযোগ আসে। সুতরাং ভারতের সব রাজ্যের সমস্ত খেলোয়াড়ই দলের এবং নিজের সুনামের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। ফলে দর্শকরাও খেলা দেখে প্রচুর আনন্দ পাবেন।

Progressive/UIB

রোভার্স পেল মোহনবাগান

মুকুল দত্ত

শ্যাম থাপা (রোভার্সে মোহনবাগানের সাতটি গোলের মধ্যে পাঁচটিই শ্যামের)

বোম্বাই থেকে রোভার্স কাপ নিয়ে এসেছে মোহনবাগান। ঠিক গত বছরের মত। গত বছর ফাইনালে হারিয়েছিল মফতলাল মিলস স্পোর্টস ক্লাবকে। এবার ফাইনালে হারাল বোম্বাইয়ের আর এক টিম টাটা স্পোর্টস ক্লাবকে। প্রথম দিনের ফাইনালে কোন গোল হয়নি। দ্বিতীয় দিন মোহনবাগান জেতে ২—১ গোলে।

তোমরা তো জানই, রোভার্স কাপ জয়ের আগে মোহনবাগান জিতেছে বরদলুই ট্রফি আর আই এফ এ শীল্ড। এর পর যদি ডুরাণ্ড কাপ পায়, এবং এককভাবে পায়, তবে সেটা হবে ভারতের ফুটবল খেলায় এক নতুন নজির। কেননা, সত্যিকারের 'ট্রিপল ক্রাউন'-এর অধিকারী হবে।

ইংরেজি 'ট্রিপল ক্রাউন' কথাটির মানে নিশ্চয় তোমরা জানো। ট্রিপল মানে তিন। ক্রাউন মানে মুকুট। তিনটি প্রতিযোগিতার জয়কে বলা হয় ট্রিপল ক্রাউন লাভ। কিন্তু তিনটি প্রতিযোগিতা তো মোহনবাগান ইতিমধ্যেই জয় করেছে। তাহলে ট্রিপল ক্রাউন হচ্ছে না কেন? হচ্ছে না এই জন্য যে ত্রি-মুকুটের জন্য তিনটি বড় প্রতিযোগিতা চিহ্নিত করা আছে। সেই তিনটি বড় প্রতিযোগিতা হচ্ছে—আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ ও ডুরাণ্ড কাপ।

যাই হোক, একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একবার ট্রিপল ক্রাউন পেয়েছে। কিন্তু সরাসরি তিনটি প্রতিযোগিতাই জিতে নয়। মোহনবাগানের সঙ্গে একটি প্রতিযোগিতায় যুগ্মভাবে জয়ী হয়ে। তাই তো বলছি, যদি ফাইনালে মোহনবাগান এককভাবে ডুরাণ্ড কাপ পায় তাহলেই হবে নতুন নজির।

তিনটি বড় প্রতিযোগিতা নিয়ে কলকাতা, দিল্লি এবং বোম্বাইয়ের মধ্যে রেষারেষিও কম নয়। দিল্লির দাবি, ডুরাণ্ডের মর্যাদা বেশি। কারণ ভারতের প্রথম নামী প্রতিযোগিতা। চলছে ১৮৮৮ সাল থেকে। বোম্বাইয়ের যুক্তি, অসামরিক দলের প্রথম প্রতিযোগিতা রোভার্সের অভিজাত্য বেশি। ডুরাণ্ড তো বহুদিন শুধু ব্রিটিশ সামরিক দলের প্রতিযোগিতা ছিল। অসামরিক দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। তা ছাড়া আই এফ এ শীল্ডেরও দুবছর আগে থেকে রোভার্সের খেলা আরম্ভ। শুরু হয় ১৮৯১ সালে। কলকাতার কথা, যেহেতু কলকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল কেন্দ্র, এবং কলকাতায় ফুটবলের রমরমা সবচেয়ে বেশি, সেই হেতু আই এফ এ শীল্ড সর্বভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা।

রোভার্সের খেলার কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। এবার রোভার্স কাপ জয়ে মোহনবাগানের বাহাদুরি এই কারণে আরও বেশী যে, সেমিফাইনালে ২-০ গোলে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারায়। তার আগে কোয়ার্টার ফাইনালে গোয়ার চ্যাম্পিয়ন ভাস্কো ক্লাবকে হারায় ৩-১ গোলে। এবার নিয়ে মোহনবাগান ১৬ বার রোভার্স ফাইনাল খেলে ৮ বার বিজয়ী হল। এতকাল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের জয়ের সংখ্যা সমানই ছিল। ১০ বার ফাইনাল খেলে ইস্টবেঙ্গল ট্রফি পেয়েছে ৭ বার, হেরেছে ৩ বার।

ভারতের প্রায় সমস্ত নামী দলই এবার রোভার্সে খেলেছে। কলকাতার মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ছাড়া খেলেছে আরও চারটি দল—খিদিরপুর, বি এন আর, এরিয়ান ও মহমেডান স্পোর্টিং। পুনে জেলা দলকে ৩-২ গোলে হারিয়ে খিদিরপুর টাই-ব্রেকারে ৫-৪ গোলে হেরে যায় গোয়ার ভাস্কোর কাছে। তৃতীয় রাউণ্ডে বি এন আর ২—১ গোলে হারে গোয়ার আর এক ক্লাব সালগাঁওকারের কাছে। এরিয়ান ২—০ গোলে ওয়েস্টার্ন রেলকে এবং ৩—০ গোলে ডেমপোকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। সেখানে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন ওরকে মিলস তাদের ৩—২ গোলে হারিয়ে দেয়। মহমেডান স্পোর্টিংকে প্রি-কোয়ার্টারে হারায় টাটা স্পোর্টস ২—০ গোলে। কলকাতার চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলার আগে বোম্বাই চ্যাম্পিয়ন ওরকে মিলসকে ৩—০ গোলে হারায়, প্রথম দিন ড্র করার পর।

এবার রোভার্সে মোহনবাগানের চারটি খেলায় ৭টি গোলের মধ্যে ৫টি গোল করেছে শ্যাম থাপা। ভাসকোর বিরুদ্ধে তিনটির মধ্যে দুটি, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দুটি এবং টাটার বিরুদ্ধে দুটির মধ্যে একটি। গোল করতে পারেনি শুধু প্রথম দিনের গোলশূন্য ফাইনালে।

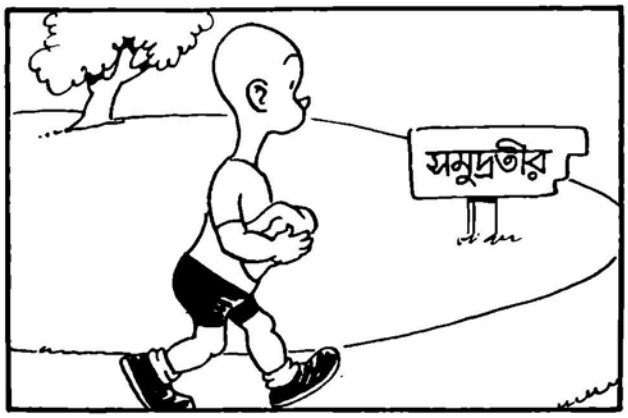
সমুদ্রতীর

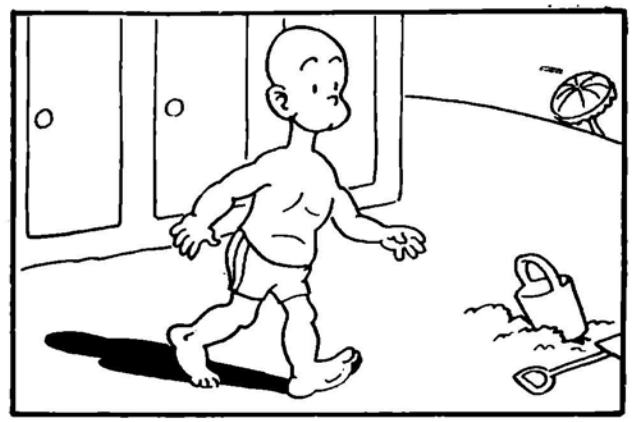

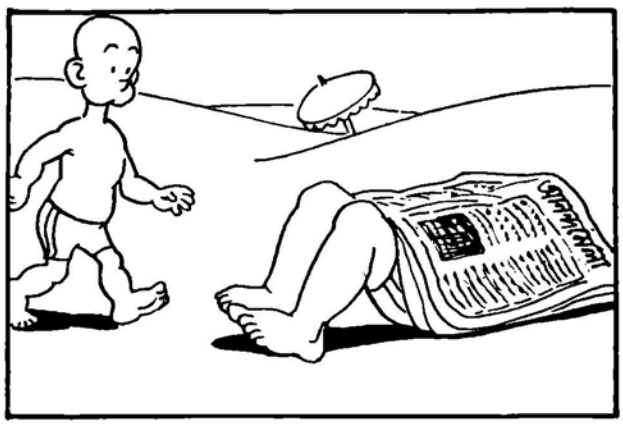

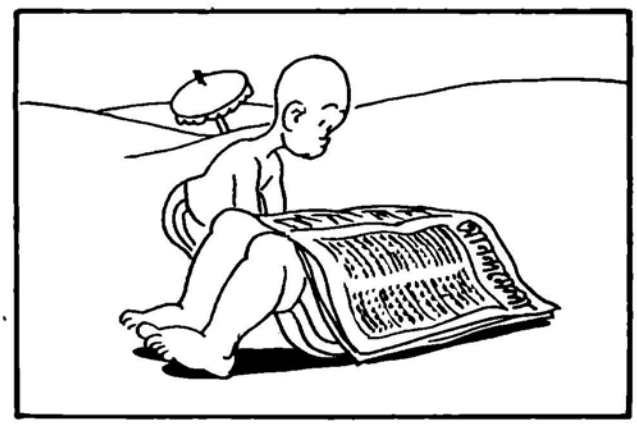

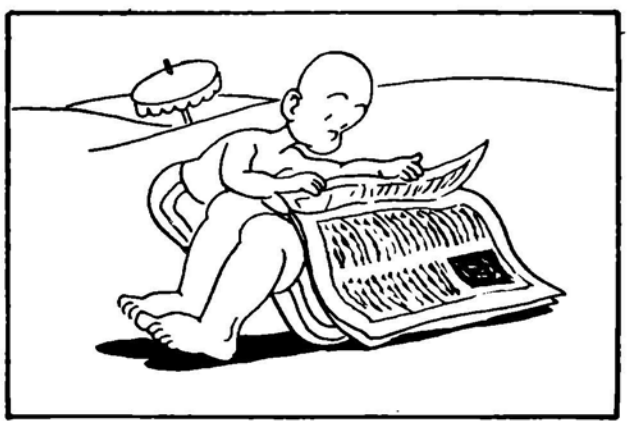

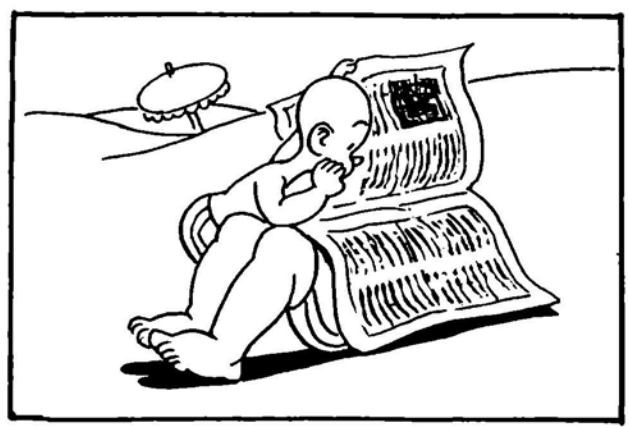

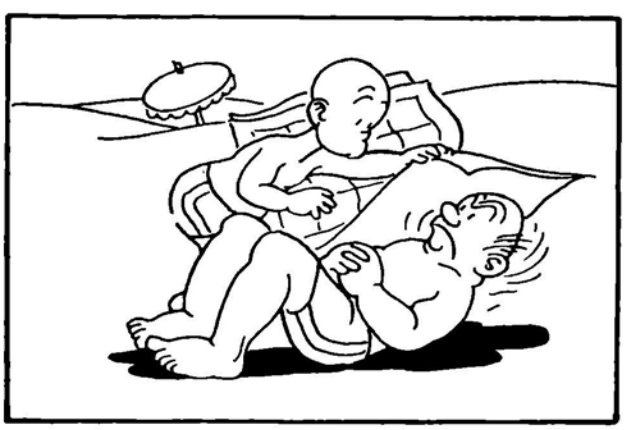

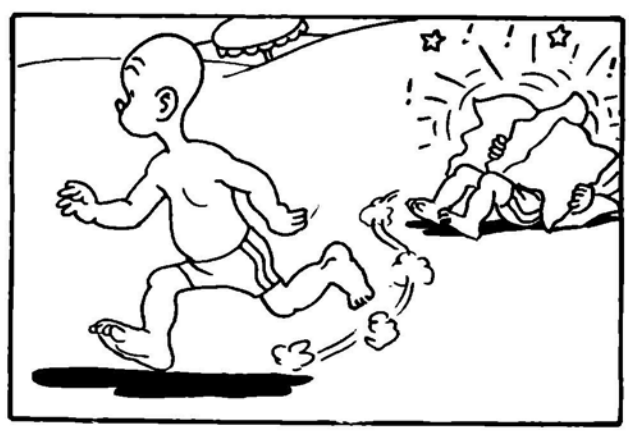

ডোডো তাতাই

লেখা। তারাপদ রায়
রেখা। কৃত্তিবাস রায়

তাতাইবাবু এখন সাড়ে চার ফুট লম্বা হয়েছেন, ডোডোবাবু হয়েছেন পৌনে পাঁচ ফুট। ছোটবেলায়, মানে যখন তাতাইবাবু তিন ফুট ছিলেন, যখন সদ্য অ-আ-ক-খ শুরু করেছেন, তখন তাতাইবাবুর হাতের লেখা ছিল বিরাট মোটা-মোটা। স্লেটের একটা দিক পুরো লেগে যেত শুধু একটা অ কিংবা ক লিখতে। তারপর আস্তে আস্তে হাতের লেখা ছোট হতে শুরু করল। "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল" যখন লিখতে শিখলেন, তাতাইবাবুর একেকটা অক্ষরের আকার তখন দু ইঞ্চিতে নেমে এসেছে। এরকম দুটো লাইন একটু চেষ্টা করলেই এক পৃষ্ঠায় এঁটে যেত।

ডোডোবাবুর অতীত ইতিহাসও প্রায় একই রকম জীবনে প্রথম যে ঈ-টি তিনি লেখার চেষ্টা করেন তার টিকি শ্লেটের ছাদে আটকিয়ে গিয়েছিল এবং পরের দিন 'ঊ'র টিকি এবং লেজ দুই-ই হ্রস্ব হয়ে গিয়েছিল।

বহু কষ্টে ডোডোবাবু, তাতাইবাবু দুজনেই নিজেদের হাতের লেখা যথাসাধ্য গুটিয়ে নিয়েছেন। এতটা গুটিয়ে নিয়েছেন যে বিশ্বাস করা কঠিন। আসলে ব্যাপারটা হল, ছোটরা যত বড় হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকে তাদের বড় বড় হাতের লেখাগুলো ছোট হতে থাকে। এখন ডোডোবাবু কত অনায়াসে একটা এক টাকার নোটের সাদা জলছবির অংশটায় নিজের নাম ঠিকানা, ইস্কুল, ক্লাস, সেকশন, রোল নম্বর এমন কী তারিখ পর্যন্ত ধরিয়ে দেন। আর তাতাইবাবুর তো কথাই নেই, এই তো পুজোর পরে এক-একটা পোস্ট কার্ডের পিছনের অর্ধেককে পরপর তিনজনকে বিজয়ার ভালবাসা জানিয়েছেন।

অবশ্য হাতের লেখা ছোট না করলে এখন আর রক্ষা নেই। পরীক্ষার প্রশ্ন আর খাতা এখন একসঙ্গে। মাত্র তিন আঙুল জায়গায় তাতাইবাবুকে মানবদেহের চিত্রসহ বর্ণনা দিতে হয়েছে, আর ডোডোবাবুর পরীক্ষায় চিড়িয়াখানা ভ্রমণের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে এর চেয়েও কম জায়গায়।

প্রাণের দায়ে এখন ডোডোবাবু-তাতাইবাবু চেষ্টা করে যাচ্ছেন, হাতের লেখা কত ছোট করা যায়। তাঁরা শুনেছেন একটা চালের পিঠে কে যেন, একটা চিঠি লিখে ফেলেছে। এতটা তাঁরা পারবেন না, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁরা নিজেদের বাঁ হাতের তালুতে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত লিখে ফেলতে পারছেন।

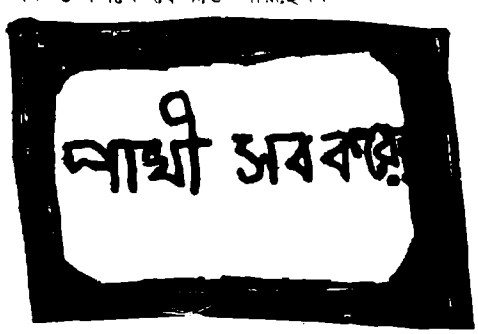

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

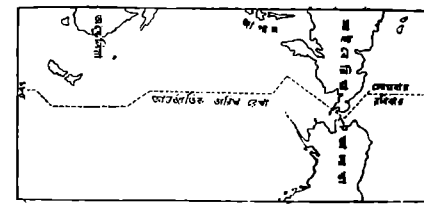

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

পৃথিবীতে এমন একটি রেখা আছে যার দুদিকে একই দিনে একই সময়ে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তারিখ, ভিন্ন ভিন্ন বার—একথা যদি বলা হয় তাহলে হয়ত অনেকেই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্যি সত্যি বার, তারিখ ও সময়ের হিসেবের সুবিধের জন্যে পৃথিবীতে এই রকম একটা রেখা কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে—যার নাম দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বা ইণ্টারন্যাশনাল ডেট লাইন। তারিখের হেরফের হয় বলেই এই নামকরণ। এই রেখাটি ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। পৃথিবী গোল বলে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একটি রেখায় এসে এক হয়ে মিশে গেছে—এই রেখাটিই হল ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা। এটির দুটি নাম থাকলেও রেখাটি আসলে একটাই।

ধরে নেওয়া যাক, দ্রাঘিমা রেখা কাকে বলে তোমরা সকলেই জানো। পৃথিবীর মানচিত্রে দেখবে উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বা লম্বা কতগুলো রেখা আঁকা আছে—ওগুলি অবশ্য সত্যিই পৃথিবীর ওপর আঁকা নেই—সময় এবং অন্যান্য অনেক কিছুর সুবিধার জন্যে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে—এগুলিকেই বলা হয় দ্রাঘিমা রেখা বা মধ্য রেখা। লণ্ডনের কাছে অবস্থিত গ্রীনিচ আবহাওয়া অফিসের ওপর দিয়ে যে মধ্য-রেখাটি গেছে তাকে মূল মধ্য রেখা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটিকে ধরা হয়েছে শূন্য ডিগ্রি। গ্রীনিচের পশ্চিমে আছে ১৮০টি দ্রাঘিমা বা মধ্যরেখা এবং পূর্বেও আছে ১৮০টি দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখা। গ্রীনিচের পূর্বে গেলে প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমায় সময়ের বৃদ্ধি হয় চার মিনিট। অতএব ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার সময় হবে গ্রীনিচের সময়ের চেয়ে ১৮০×৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা বেশি। গ্রীনিচের পশ্চিমে আবার প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার সময় কমে যায় চার মিনিট করে। অতএব ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমার সময় হবে ১৮০×৪ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা কম। এর থেকেই বোঝা যায়, ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা বা মধ্য-রেখার পূর্ব ও পশ্চিম পাশে সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ১২+১২ ঘণ্টার—অর্থাৎ পুরো একটা দিনের। পূর্ব দিকে অর্থাৎ এশিয়ার দিকে সময় একদিন এগিয়ে যায় ও পশ্চিমে আমেরিকার দিকে সময় একদিন পেছিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে একদিন বাড়ে বা কমে। অবশ্য রেখাটির দুপাশে সময় থাকে একই। পূর্বে যদি রাত্রি আটটা হয় পশ্চিমেও হবে রাত্রি আটটা—তফাত থাকবে শুধু কী বার তাই নিয়ে। পূর্ব দিকে অর্থাৎ এশিয়ার দিকে যখন সোমবার ৪ জানুয়ারি, পশ্চিম দিকে অর্থাৎ আমেরিকার দিকে তখন রবিবার ৩ জানুয়ারি। রেখাটি জাহাজে বা প্লেনে পার হতে হয়ত এক মিনিটের বেশি লাগবে না, কিন্তু তার ফলে পার্থক্য ঘটে যাবে পুরো একটি দিনের।

আসলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত হলেও সব জায়গাতেই সেই রেখাটি অনুসরণ করে চলা হয়নি। দ্বীপপুঞ্জগুলিকে তারিখ বিভ্রাটের সমস্যা থেকে মুক্ত করার জন্যে লাইনটি পূর্বে ও পশ্চিমে এঁকেবেঁকে গেছে। এই কারণে এই রেখাটি পুরাপুরিই প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে গেছে—কোনো স্থলভূমিকে স্পর্শ করেনি। এই রেখাটি আরম্ভ হয়েছে সাইবেরিয়ার পূর্বতম বিন্দুর পাশে বেরিং প্রণালীর মধ্যে; জাপান, ফিলিপাইন, নিউগিনি ও নিউজিল্যাণ্ডের পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে এই রেখা শেষ হয়েছে দক্ষিণ মেরু বিন্দুতে।

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্র আয়োজিত 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতা আগামী ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে কোনও বিদ্যালয় ও সংগঠনের ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক—২, রুম—৫, কলকাতা-৭০০০২৯ (ফোন : ৪৬-৯৮১০) ঠিকানায় ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত নাম দেওয়া যাবে। প্রবেশ দক্ষিণা এক টাকা।

১২ নভেম্বর মণিমেলার নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি ভাইফোঁটা অনুষ্ঠান পালন করে। ১৪ নভেম্বর বিভিন্ন মণিমেলাগুলি বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরি, শোভাযাত্রা, ক্রীড়ানুষ্ঠান মঞ্চানুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে শিশুরোগীদের ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

২০ নভেম্বর মহাকেন্দ্র কার্যালয়ে মণিমেলা লাকি কুপন ড্র অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ জন পুরস্কার পান।

আঞ্চলিক সংবাদ

দমদম আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে বর্ণালী মণিমেলা। দ্বিতীয়—কৃষ্ণপুর মণিমেলা। শ্রেষ্ঠ আদেশদানকারী—কৃষ্ণপুর মণিমেলার শ্রীগণেশ রায়।

যাদবপুর আঞ্চলিক খো খো প্রতিযোগিতায় ভায়েদের বিভাগে বিজয়ী মহাজাতি মণিমেলা, এবং বিজিত বিক্রমগড় মণিমেলা।

মণিসন্দেশ

কলকাতার কসবা মণিমেলার ৩৬তম বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়েছে। ২৪ পরগনার নারায়ণপল্লী মণিমেলার চতুর্থ বার্ষিক উৎসব পালিত হয় ৮ অক্টোবর। শ্যামনগরের নূতন পল্লী কিশলয় মণিমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৩ নভেম্বর একটা ক্রীড়া প্রদর্শনী হয়।

Free !! Free !! Free !!

ধবল বা শ্বেত

আমাদের চিকিৎসা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের সাদা দাগ মিলিয়ে গিয়ে ত্বকের স্বাভাবিক রঙ ফিরে আসবে। তাই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি রাতারাতি জনসাধারণের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। আমাদের ঔষধের ব্যবহারের প্রথম দিন থেকেই উপকারিতা লক্ষ্য করা যাবে। অসুখের পূর্ণ বিবরণসহ বিনামূল্যে আমাদের ঔষধের জন্য সত্বর নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

BHARAT AYURVEDASHRAM

P. O. KATRI SARAI (GAYA)

সার্কাস

এবার শীত এল অনেক দেরিতে। এত দেরিতে যে, মনে হচ্ছিল শীত এবার বুঝি আর এলই না। কিন্তু তাই কি কখনও হয়! শীত দেরিতে হলেও এসেছে। শুধু আসাই নয়, জাঁকিয়েও বসেছে দিব্যি। জাঁকিয়ে বসেছে শীতকালে যা-যা বসে, সে সবই। যেমন, সার্কাস। মাঠের মাঝখানে বিশাল তাঁবু, চারদিকে টিনের বেড়া। গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলেই হাজার মজা। এত মজা যে, সার্কাস শেষ হয়ে গেলেও তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় থাকি, আর একটু থাকি। বুনো জন্তু-জানোয়ারকে কে না ভয় করে? কিন্তু, সার্কাসের জন্তু-জানোয়াররা সব আলাদা ধরনের। এরা মানুষের কথায় ওঠে, বসে, সাইকেল চালায়, খেলা করে। কেউই দুষ্টুমি করে না, মারামারি করে না, কাউকে কামড়ে দেয় না, কী বাধ্য সবাই! শুধু এদের খেলাই নয়, সঙ্গে আছে মানুষের খেলা। দেখলে তাক লেগে যায়। শূন্যে ঝুলে ঝুলে খেলা দেখানোকে বলে ট্রাপিজের খেলা, ট্রাপিজের খেলা দেখলে গা শিরশির করে ওঠে। সার্কাসের খেলা বোধ হয় কখনোই পুরনো হয় না। যত দেখা যায় ততই ভাল লাগে। আর, শীতকাল এলেই সবার আগে যার কথা মনে পড়ে তার নাম সার্কাস, তাই না?

নোলেদা তার টীম নিয়ে খেলতে গেছে আমেরিকায়
সুপ্রভাত! নোলেদা!
সুপ্রভাত! পেলেদা!

তুমি ফুটবলের রাজা
তুমি ফুটবলের জাদুকর!

খেলা শুরু হল!

হঠাৎ নোলেদা পা দিয়ে নয় হাত দিয়ে দৌড়াতে শুরু করল!

বলটা দু পায়ের মধ্যে বাগিয়ে ধরা! ফাউল তো হতে পারে না!
?

নোলেদা বলবলিয়ে চলেছে!

এটা কী হচ্ছে নোলেদা?

আমি জীবনে এমন কায়দা ভাবিনি!

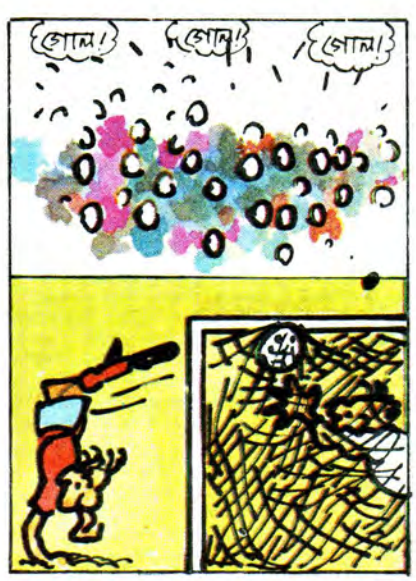
গোল!
গোল!
গোল!

আঁকো

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

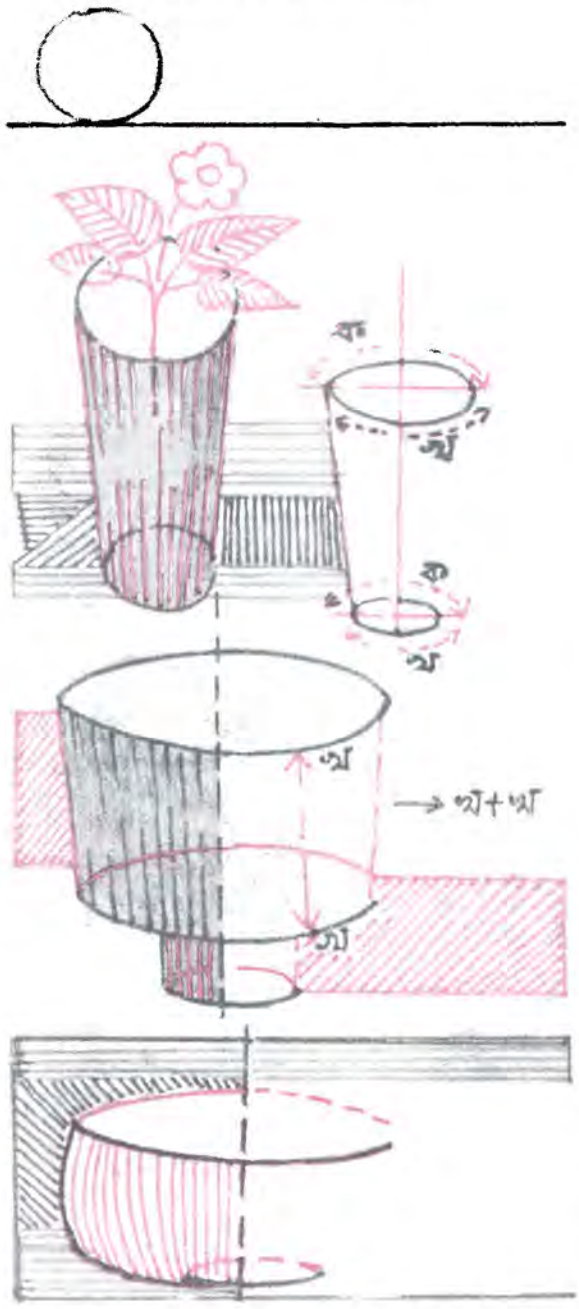

ফুলদানি, গেলাস, ঘটি, বাটি আঁকা যতটা শক্ত বলে মনে হয় ততটা কখনই নয়। একটা নিয়ম মনে রাখলে দেখবে কত সোজা এসব আঁকা।

ধরো, ফুলদানি বা গেলাস আঁকতে যাচ্ছ। প্রথমে মুখের গোল অংশ এঁকে, যতটা লম্বা দরকার সেই মতো তফাতে নীচে আর একটা গোল এঁকে দুটোর প্রান্তভাগ রেখা দিয়ে জুড়ে দিলেই ফুলদানি পাবে।

একটা জিনিস লক্ষ করো (নমুনা দেখ)। দুই গোলের খ-অংশের সঙ্গে খ-অংশই জোড়া হয়েছে। যদি তা না করে খ+ক অংশ জুড়ে দাও, তাহলে দেখবে, পাত্রের দাঁড় করান ঢংয়ের পরিবর্তন ঘটছে।

শেখো

কারিগর

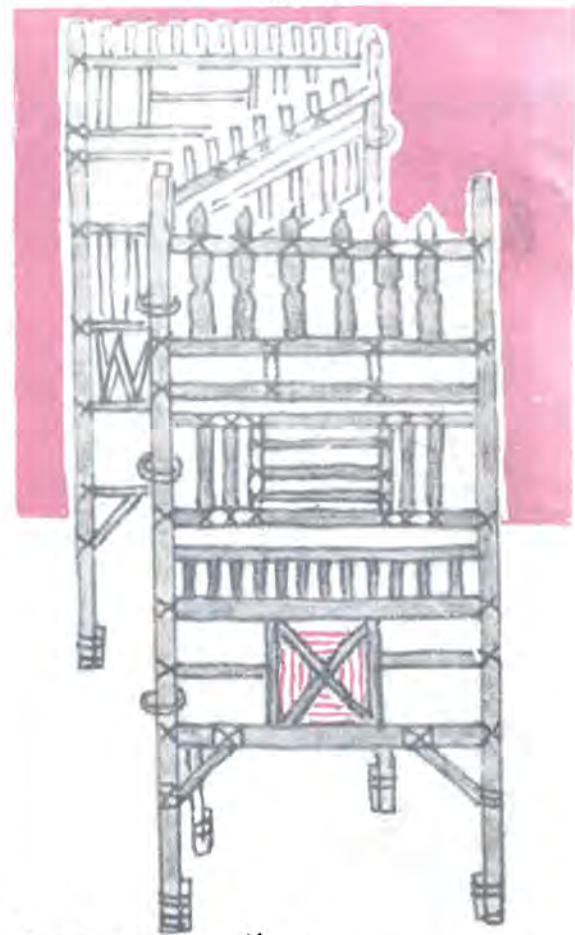

বাঁশের কাজ, পার্টিশন

এবার তৈরি করো পার্টিশন। যা পড়ার ঘর বা বসার ঘর থেকে আলাদা করবে অন্য ঘর। জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো দড়ি, তার আর ছোট পেরেক।

শুরু করার আগে সমস্ত পার্টিশনের একটা খসড়া করে নাও। তাদের নিজের দরকার মতো লম্বা চওড়া অন্যান্য ভাগ ছকে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে ফ্রেমের মধ্যে কী ধরনের নকশার বাহার থাকবে তাও মাপমতো ছকে নাও।

শুরু করো। প্রথম বাঁশের চারটে অংশ মাপমতো কেটে নিয়ে জুড়ে ফ্রেমের মত করে নাও। এই ফ্রেমের চার অংশ বেশ শক্ত করে দাঁড় দিয়ে দরকার পড়লে সরু তার ব্যবহার করে বেঁধে নাও। ফ্রেম তৈরি হলে তোমার নকশা মাফিক টুকরো বাঁশগুলো জুড়ে কাজ শেষ করো। যতভাগ শেষ শন করবে, প্রত্যেকটি ভাগই এইভাবে শেষ হলে পার্টিশ —.া পরস্পর জুড়ে নাও মোটা তার বা বাঁশের বাতা দিয়ে। একটা জিনিস মনে রেখো—ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটা পার্টিশনের জন্যে আলাদা-আলাদা নকশা করতে পারো। সব কাজ শেষ হলে কোপাল ভারনিশ মাখিয়ে চকচকে করে নাও। ইচ্ছে করলে এর গায়ে পুঁতি, পুতুল, কাপড়ের টুকরো জুড়ে বাহার আনতে পারো।

জেনে রাখো—(১) ফ্রেম বাঁধার কাজে রঙিন দড়ি ব্যবহার করলে দেখতে সুন্দর হবে। (২) ফ্রেমের জন্য গোল বাঁশ ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। (৩) নীচের পায়ার অংশে টুকরো জুড়ে দিলে পোক্ত হবে। (৪) পার্টিশনের ফ্রেমের মাঝে ইচ্ছে করলে বাঁশের নকশা না করে রঙিন নকশাকারী কাপড় ব্যবহার করতে পারো। (৫) কাজের আগে বাঁশ সব সময় দু-একদিন জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নেবে। (৬) এ-সব কাজে কাঁচা বাঁশ কখনই ব্যবহার করবে না। (৭) পেরেক ঠোকার সময় আস্তে ঠুকবে।

ভেনাস সার্কাস

স্থানঃ পার্ক সার্কাস ময়দান, কলিকাতা

খ্যাতিসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের অসামান্য খেলা, পোষাকের জাঁকজমক, ভাঁড়ের ভাঁড়ামি, হিংস্র পশুদের সঙ্গে সুন্দরীদের অসমসাহসিক ক্রিয়াকলাপ, আপনাকে কখনও ভীত কখনও চকিত কখনও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবে।

আপনার দেখা সেরা সার্কাসের চেয়েও সেরা।

প্রত্যহ ৩টি প্রদর্শনী—বেলা ১টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায়।

অগ্রিম টিকিট কেবলমাত্র ৬·৫০ ও ৪·৮০, ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দেওয়া হইবে।

টিকিটের হার : গ্যালারি—১·৬০, দ্বিতীয় শ্রেণী—২·৮০, প্রথম শ্রেণী—৪·৮০, ডিসি—৬·৫০।

everest/871/PP-bn